নারীর প্রাকৃতিক রক্তস্রাব

[Bengali - বাংলা - بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন

৪০৩২

অনুবাদ: মীযানুর রহমান আবুল হুসাইন

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الدماء الطبيعية للنساء
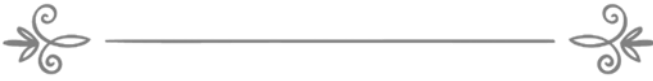
محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: ميزان الرحمن أبو الحسين

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

IslamHouse.com

সূচীপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৩
২	১ম পরিচ্ছেদ: হায়েযের অর্থ ও তা সৃষ্টির রহস্য	৬
৩	২য় পরিচ্ছেদ: হায়েযের বয়স এবং সময়-সীমা	৮
৪	গর্ভবতী মহিলার রক্তস্রাব	১৭
৫	৩য় পরিচ্ছেদ: হায়েয অবস্থায় আপতিত কিছু বিষয়	২০
৬	৪র্থ পরিচ্ছেদ: হায়েযের বিধি-বিধান	২৬
৭	ঋতুবতী মহিলার স্বয়ং কুরআন তিলাওয়াত করার হুকুম	২৯
৮	৫ম পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযাহ ও তার বিধান	৪৯
৯	মুস্তাহাযাহ তথা অস্বাভাবিক রক্তস্রাবে আক্রান্ত নারীর বিভিন্ন অবস্থা	৫০
১০	মুস্তাহাযার সদৃশ নারীর অবস্থার বিবরণ	৫৫
১১	ইস্তেহাযার বিধি-বিধান	৫৬
১২	৬ষ্ট পরিচ্ছেদ: নিফাস ও হুকুম	৬১
১৩	নিফাসের হুকুম	৬৪
১৪	৭ম পরিচ্ছেদ: হায়েয প্রতিরোধক কিংবা সঞ্চালক এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকারী কিংবা গর্ভপাতকারী ঔষধ ব্যবহারের বিধান।	৬৯
১৫	উপসংহার	৭৬

ভূমিকা

নারী জাতি সাধারণত তিন প্রকার রক্তস্রাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে:

১. হায়েয (মাসিক রক্তস্রাব)।

২. ইস্তেহাযাহ (হায়েয ও নিফাসের দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হয়)।

৩. নিফাস (সন্তান প্রসবের পরের রক্তস্রাব)।

উপরোক্ত তিন প্রকার রক্তস্রাব এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত যার বিধি-বিধানের বর্ণনা অতীব জরুরী এবং এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে ভুল-শুদ্ধ পার্থক্য নিরূপন করে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভিত্তিতে যা সঠিক ও নির্ভুল তা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। কেননা,

প্রথমত: মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ইবাদতের যে সকল হুকুম-আহকাম দিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে সেগুলোর মূল ভিত্তি এবং উৎস।

দ্বিতীয়ত: কুরআন ও হাদীসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তদনুযায়ী আমল করলে আত্মিক প্রশান্তি, মানসিক স্থিরতা, মনের আনন্দ এবং অল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি অর্জিত হয়।

তৃতীয়ত: কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই শরী'আতের আইন-কানূন ও বিধি বিধানের দলীল হতে পারে না। শরী'আতের

সমুদয় আইন-কানূন ও হুকুম-আহকামের একমাত্র মানদণ্ড হলো কুরআন ও হাদীস। তবে অভিজ্ঞ সাহাবীগণের অভিমতও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীল হতে পারে। এর জন্য শর্ত হচ্ছে সাহাবীর অভিমত ও কুরআন-সুন্নাহ'র মাঝে কোনো অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য না থাকা, এমনিভাবে অন্য কোনো সাহাবীর সিদ্ধান্তের পরিপন্থীও না হওয়া। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি কখনো কোনো সাহাবীর অভিমত এবং কুরআন-হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ'র সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ও বরণ করা ওয়াজিব হবে। আর দুই সাহাবীর মত ও সিদ্ধান্তে বৈপরীত্য দেখা দিলে দু'টোর শক্তিশালীটিকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]

"যদি তোমরা পরস্পর কোনো বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড় তাহলে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পিত কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান আনয়ন করে থাক। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

এই পুস্তিকাটি নারী জাতির উপরোক্ত তিন প্রকার রক্তস্রাব ও তার হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর ওপর সংক্ষিপ্তাকারে রচিত এবং সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদগুলো হচ্ছে:

১ম পরিচ্ছেদ: হায়েযের অর্থ ও তা সৃষ্টির রহস্য।

২য় পরিচ্ছেদ: হায়েযের বয়স এবং সময়-সীমা।

৩য় পরিচ্ছেদ: হায়েয সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী।

৪র্থ পরিচ্ছেদ: হায়েযের বিধি-বিধান।

৫ম পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযাহ ও তার হুকুম।

৬ষ্ট পরিচ্ছেদ: নিফাস ও তার হুকুম।

৭ম পরিচ্ছেদ: হায়েয প্রতিরোধক কিংবা সঞ্চালক এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকারী কিংবা গর্ভপাতকারী ঔষধ ব্যবহারের বিধান।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হায়েযের অর্থ ও তা সৃষ্টির রহস্য

হায়েযের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তু নির্গত ও প্রবাহিত হওয়া।

আর শরী'আতের পরিভাষায় হায়েয বলা হয় ঐ প্রাকৃতিক রক্তকে, যা বাহ্যিক কোনো কার্য-কারণ ব্যতীতই নির্দিষ্ট সময়ে নারীর যৌনাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয়।

হায়েয প্রাকৃতিক রক্ত। অসুস্থতা, আঘাত পাওয়া, পড়ে যাওয়া এবং প্রসবের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রাকৃতিক রক্ত নারীর অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিভিন্নতার কারণে নানা রকম হয়ে থাকে এবং এ কারণেই ঋতুস্রাবের দিক থেকে নারীদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

বিস্ময়কর তাৎপর্য:

পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি মানুষ ও প্রাণী আহার্য সংগ্রহ করে থাকে, বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য খেয়ে জীবন যাপন করে, কিন্তু নারীর গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চার পক্ষে সে ধরনের খাদ্য বা আহার্য গ্রহণ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় এবং কোনো দয়াপরবশ মানুষের পক্ষেও গর্ভস্থ বাচ্চার নিকট খাদ্য সরবরাহ করা অসম্ভব। ঠিক এমনি মুহূর্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নারী জাতির মাঝে রক্ত প্রবাহের এমন এক আশ্চর্য ধারা স্থাপন করেছেন, যার দ্বারা মায়ের গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চা মুখ দিয়ে খাওয়া এবং হজম করা ছাড়াই আহার্য গ্রহণ করতে পারে।

উক্ত রক্ত নাভীর রাস্তা দিয়ে বাচ্চার শরীরে প্রবাহিত হয়ে শিরাসমূহে অনুপ্রবেশ করে এবং বাচ্চা এর মাধ্যমে আহার্য গ্রহণ করে। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময় ও মহান। এটাই হায়েয সৃষ্টির মূল রহস্য এবং এ কারণেই যখন কোনো নারী গর্ভবতী হয় তখন তার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কদাচিৎ এর ব্যতিক্রমও হয়, যা বিবেচনার মধ্যে পড়ে না। তেমনিভাবে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো অবস্থায় খুব কম সংখ্যক মহিলারই হায়েয হয়ে থাকে, বিশেষ করে দুধ খাওয়ানোর প্রাথমিক অবস্থায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রক্তস্রাবের বয়স ও তার সময়-সীমা

এই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় দু'টি:

১. নারীদের রক্তস্রাব কত বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং কত বছর বয়স পর্যন্ত চালু থাকে।

২. রক্তস্রাবের সময়-সীমা।

প্রথম বিষয়: সাধারণত ১২ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের রক্তস্রাব হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো অবস্থা, আবহাওয়া এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত বয়সের পূর্বে এবং পরেও রক্তস্রাব হতে পারে।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন যে, রক্তস্রাব হওয়ার জন্য নারীদের বয়সের এমন কোনো নির্দিষ্ট সীমা-রেখা আছে কি না, যার আগে বা পরে রক্তস্রাব হয় না। আর যদিও বা হয় তাহলে সেটা অসুস্থতা হিসেবে পরিগণিত হবে, না রক্তস্রাব হিসেবে?

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবুল ফারাজ আদ-দারেমী রহ. (মৃ.৪৪৮ হি.) সকল মতামতগুলো উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'আমার নিকট এর কোনোটিই ঠিক নয়। কেননা রক্তস্রাবের জন্য বয়স নির্দিষ্ট করা বা বয়সের সীমা-রেখা নির্ণয় করা নির্ভর করে রক্তস্রাব দেখা দেওয়ার ওপর। সুতরাং যে কোনো বয়স এবং যে কোনো সময়ে নারীদের

যৌনাঙ্গে কোনো প্রকার রক্ত দেখা দিলে সেটাকে রক্তস্রাব বা হায়েয হিসেবে গণ্য করা ওয়াজিব।’ আল্লাহ তা‘আলাই সর্বজ্ঞ।[1]

আমার দৃষ্টিতে ইমাম দারেমীর এই অভিমতটি সঠিক বলে মনে হচ্ছে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ.-ও এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। অতএব, নারী যখনই তার যৌনাঙ্গে রক্ত দেখতে পাবে তখনই সে ঋতুবতী হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। যদিও সে রক্ত নয় বছর বয়সের পূর্বে কিংবা পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে দেখা দেয়। কেননা হায়েযের সমুদয় হুকুম-আহকামকে মহান আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত দেখা দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এর জন্য বয়সের কোনো নির্দিষ্ট সময়-সীমা নির্ধারণ করেন নি। সুতরাং যে রক্তস্রাবকে হুকুম-আহকামের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখা হয়েছে সেটা দেখা দিলেই তার নির্ধারিত বিধান পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ঋতুস্রাবকে কোনো নির্দিষ্ট বয়সের সাথে সম্পৃক্ত করতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক কোনো একটি নিশ্চিত দলীলের প্রয়োজন রয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোনোই প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয় বিষয়: ঋতুস্রাবের সময়-সীমা অর্থাৎ ঋতুস্রাব কতদিন থাকতে পারে। এ ব্যাপারেও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে, এমনকি এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ছয় অথবা সাতটি অভিমত পাওয়া যায়। ইবনুল মুনযির এবং ফিকহবিদগণের একটি দল বলেছেন

---

[1] আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহায্যাব: ১/৩৮৬।

যে, হায়েয কমপক্ষে এবং বেশির পক্ষে কতদিন থাকতে পারে এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা-রেখা নেই। আমার অভিমত ইমাম দারেমীর উল্লিখিত অভিমতের মতই যা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ.-ও গ্রহণ করেছেন এবং এটিই সঠিক, কেননা কুরআন, সুন্নাহ ও কিয়াস দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়।

১ম দলীল: আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন,

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

"তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বলে দাও, এটা কদর্য বস্তু, কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাক এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকট যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২২]

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে স্ত্রী সঙ্গমের নিষেধাজ্ঞার শেষ সীমা নির্ধারণ করেছেন। এক দিন এক রাত, তিন দিন তিন রাত অথবা পনের দিন পনের রাতকে নিষেধাজ্ঞার শেষ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করেন নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, ঋতুস্রাব দেখা দেওয়া না দেওয়ার ওপরই তার হুকুম-আহকামের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ যখনই ঋতুস্রাব দেখা দিবে তখনই তার বিধি-বিধান কার্যকরী হবে এবং যখনই বন্ধ হবে বা পবিত্রতা অর্জন করবে তখনই বিধি-বিধানের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাবে। বুঝা গেল, ঋতুস্রাব কতদিন থাকতে পারে এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই।

দ্বিতীয় দলীল: সহীহ মুসলিমে এসেছে:

«أَنَّ النَّبِيَّ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِالْعُمْرَةِ: افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ».

"উমরার ইহরাম অবস্থায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার যখন রক্তস্রাব দেখা দিয়েছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন: তুমি ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা'বা শরীফের তওয়াফ ছাড়া উমরার অন্যান্য কাজগুলো করে যাও, যেভাবে হাজীরা করে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হলে তখন তাওয়াফ করবে" আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যখন কুরবানীর দিন আসলো তখন আমি পবিত্র হলাম।"[2] সহীহ বুখারীর তৃতীয় খণ্ডের ৬১০ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

«أَنَّ النَّبِيَّ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قَالَ: انْتَظِرِيْ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِيْ إِلَى التَّنْعِيْمِ»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন: তুমি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, পবিত্রতা অর্জন করার পর উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধার জন্য তান'ঈমের দিকে বের হও।"

[2] সহীহ মুসলিম: ৪/৩০।

তান‘ঈম হারামের বাইরে মক্কা মুকাররামার উত্তর পাশে নিকটবর্তী একটি স্থান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন নি। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রক্তস্রাব দেখা দেওয়া না দেওয়ার সাথেই তার হুকুম-আহকামের সম্পর্ক। নির্দিষ্ট কোনো সময়ের সাথে নয়।

তৃতীয় দলীল: ফিকহবিদগণের হায়েয সংক্রান্ত এসব বিস্তারিত আলোচনা ও অনুমান-ধারণা কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান না থাকা সত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে বর্ণনা করা জরুরী। যদি এ সমস্ত আলোচনাকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং এগুলোর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার উপাসনা করা বান্দার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকতো তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ এবং সাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামপ্রত্যেকের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। কেননা এগুলোর সাথে নারীর সালাত, সাওম, বিবাহ, তালাক এবং মীরাসের মাসআলা-মাসায়েল সম্পৃক্ত। যেমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সংখ্যা, সালাত পড়ার নির্দিষ্ট সময়, সালাতের রুকু, সেজদাহ, যাকাতের মাল, মালের নিসাব ও পরিমাণ, যাকাত বিতরণ করার নির্দিষ্ট স্থান, সাওমের সময়-সীমা এবং হজসহ অন্যান্য বিষয়াবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম-নীতি, ঘুমের আদব, স্ত্রী সহবাস, উঠা-বসা, গৃহে প্রবেশ, গৃহ থেকে বের হওয়া, পায়খানা ও প্রস্রাবের নিয়ম-নীতিও বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয় বরং পায়খানা ও প্রস্রাব করার ব্যবহৃত ঢিলার সংখ্যা নির্ধারণ করাসহ জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়াদির বিবরণও বিশ্ব মানবের

সামনে তুলে ধরেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মনোনীত ধর্মকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং মুমিন বান্দাদের ওপর নিজের নি‘আমতকে সম্পূর্ণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা নাহলের ৮৯ নম্বর আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মোধন করে বলেন,

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: ٨٩]

“আমরা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে তোমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯]

এমনিভাবে কুরআন শরীফে সূরা ইউসুফের ১১১ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

﴿مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١]

“এটি কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ, হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১]

এখন বুঝতে হবে যেহেতু এসবের বিস্তারিত আলোচনা কুরআন ও হাদীসে নেই সেহেতু এসবের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ারও প্রয়োজন নেই। নির্ভরতার প্রয়োজন শুধু হায়েয দেখা দেওয়া না দেওয়ার ওপর। কুরআন ও সুন্নাহ’তে এ সমস্ত বিষয়াদি না থাকাটাই প্রমাণ করে যে, এগুলোর কোনো গ্রহনযোগ্যতা নেই। হায়েয (ঋতুস্রাব) সম্পর্কীয়

মাসআলাসহ অন্যান্য সকল মাসআলাসমূহে কুরআন ও সুন্নাহই আপনাকে সাহায্য করবে। কেননা শরী‘আতের সকল বিধি-বিধান কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা অথবা বিশুদ্ধ কিয়াস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে, অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে নয়। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ একটি নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: ‘কুরআন ও সুন্নাহ’তে আল্লাহ তা‘আলা রক্তস্রাবের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু হুকুম-আহকাম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু রক্তস্রাব কতদিন থাকতে পারে, এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়-সীমা কী, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। এমনকি বান্দার জন্য অত্যাধিক প্রয়োজনীয় এবং জটিল বিষয় হওয়া সত্বেও আল্লাহ তা‘আলা দুই পবিত্রতার মধ্যবর্তী সময়ের সীমা-রেখা নির্দিষ্ট করেন নি। আরবী অভিধানও এর কোনো সময়-সূচী নির্ধারণ করে নি। সুতরাং হায়েয বা রক্তস্রাবের জন্য যে ব্যক্তি কোনো সময়-সীমা নির্দিষ্ট করবে সে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করবে।’

চতুর্থ দলীল: যা বিশুদ্ধ কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা রক্তস্রাবকে ময়লা বস্তু হিসেবে ঘোষণা করেছেন, কাজেই যখনই রক্তস্রাব দেখা দিবে তখনই সেটাকে ময়লা হিসেবেই গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে রক্তস্রাবের প্রথম এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ, ১৫তম এবং ১৬তম ও ১৭তম এবং ১৮তম দিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ময়লা ময়লাই। সুতরাং ময়লা যেহেতু উভয় দিনেই বিদ্যমান সেহেতু উক্ত দুই দিনের মধ্যে হুকুমের দিক থেকে পার্থক্য করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? এটা কি বিশুদ্ধ কিয়াসের পরিপন্থী নয়? বিশুদ্ধ কিয়াস কি উভয় দিনকে হুকুমের দিক থেকে সমান গণ্য করে না?

পঞ্চম দলীল: রক্তস্রাবের জন্য সময়-সীমা নির্ধারণকারীদের পারস্পরিক মতভেদ ও সিদ্ধান্তহীনতা রয়েছে এবং এ ধরনের পারস্পরিক মতভেদই প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে এমন কোনো সমাধান নেই, যেটাকে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয়। তা ছাড়া এ সকল মতামত হচ্ছে ইজতেহাদী যা ভুল-শুদ্ধ দু'টিই সম্ভাবনা রাখে। এমতাবস্থায় সমাধান ও সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কোনো সময়-সীমা নির্দিষ্ট নেই এবং এটিই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং নারীর লজ্জাস্থানে রক্ত দেখা দিলে (যা আঘাত বা অন্য কোনো কারণে প্রবাহিত হয় নি) ধরে নিতে হবে যে এটি হায়েযের রক্ত হিসেবেই প্রবাহিত হচ্ছে এবং এর জন্য কোনো বয়স ও সময় নির্দিষ্ট নেই। তবে হ্যাঁ, এ রক্ত যদি বিরতিহীনভাবে প্রবাহিত হতে থাকে যে, আর বন্ধই হচ্ছে না অথবা অত্যন্ত স্বল্প সময় যেমন মাসে মাত্র এক-দুই দিন প্রবাহিত হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে ইস্তেহাযাহ হিসেবে গণ্য করতে হবে যার বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সামনে আসছে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. হায়েয সম্পর্কে বলেন, 'নারীদের রেহেম গর্ভাশয়) থেকে যা কিছু বের হবে তাই হায়েয বলেই গণ্য হবে যতক্ষণ না ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে অকাট্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়।' তিনি আরো বলেন, 'নারীর লজ্জাস্থান থেকে যখন কোনো প্রকার রক্ত বের হবে তখন যদি জানা না থাকে যে, এটা কি রগ থেকে বের হয়ে আসা রক্ত না কোনো আঘাত জনিত কারণে প্রবাহিত রক্ত, তাহলে সে

রক্তকে হায়েয হিসেবেই গণ্য করতে হবে।’ শাইখুল ইসলাম রহ.-এর এই অভিমত সময়-সীমা নির্ধারণকারীদের অভিমতের চেয়ে দলীল-প্রমাণের দিক থেকে যেমন শক্তিশালী, ঠিক তেমনই অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে এবং আমল ও বাস্তবায়নের দিক দিয়েও অতি সহজ। এমনকি উক্ত গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোনো মতকে দীন ও ইসলামের সার্বজনীন নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা এটা সহজসাধ্য ও সরল। যেন তা পালন করা কারো পক্ষে কষ্টকর না হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: ٧٨]

“তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেন নি।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৮]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ, وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ, فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا»

“নিশ্চয় দীন সহজ। কেউ দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে জিততে পারে না। কাজেই তোমরা মধ্য পথ অবলম্বন কর, দীনের, নিকটবর্তী থাক এবং অল্প কিন্তু স্থিতিশীল আমলের প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।”[3]

[3] সহীহ বুখারী।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ের দু'টি দিকের মধ্যে সহজ দিকটাই তিনি গ্রহণ করতেন।

গর্ভবতী মহিলার রক্তস্রাব

সাধারণত নারী যখন গর্ভবতী হয় তখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, 'রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে গর্ভবতী বলে প্রমাণিত হয়। সন্তান সম্ভবা মহিলা যদি প্রসবের অল্প সময় পূর্বে যেমন দুই দিন অথবা তিন দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব দেখে এবং সাথে যদি প্রসব বেদনা থাকে তাহলে উহাকে নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি প্রসবের অনেক পূর্বে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে তাহলে উক্ত রক্ত নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় প্রবাহিত রক্তকে কি হায়েয হিসেবে গণ্য করে তার ওপর হায়েযের বিধি-বিধান কার্যকরী করা হবে? না অসুস্থতার রক্ত গণ্য করা হবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক সমাধান হচ্ছে, সন্তান সম্ভবা মহিলার যদি পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী রক্ত দেখা দেয় তাহলে সেটাকে হায়েয হিসেবে গণ্য করতে হবে। কেননা নারীর লজ্জাস্থান থেকে যে রক্ত বের হয় তা হায়েয হওয়াটাই হচ্ছে প্রকৃত নিয়ম। হ্যাঁ, উক্ত রক্ত হায়েয নয় এর পিছনে যদি কোনো রকম শক্ত প্রমাণ থাকে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, গর্ভবতী মহিলার হায়েয হতে পারে না। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুমাল্লাহর এটিই মত।

ইবন তাইমিয়্যাহ রহ.-ও এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তার লিখিত ইখতিয়ারাত গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম বাইহাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ইমাম আহমদের এই জাতীয় একটি অভিমত রয়েছে, বরং তিনি উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমদ রহ. ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ রহ.-এর উক্ত মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখন প্রতীয়মান হলো যে, সাধারণ মহিলার হায়েযের যে হুকুম গর্ভবতী মহিলারও ঠিক সেই হুকুম। তবে নিম্নোক্ত দু'টি মাসআলায় এর ব্যতিক্রম রয়েছে:

১. তালাক: অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন মহিলা (যাকে ঋতুস্রাবের মাধ্যমে ইদ্দত পূরণ করতে হয়) তাকে ঋতুস্রাব অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। পক্ষান্তরে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে (তার ঋতুস্রাব হলেও সে ঋতুস্রাব) অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম নয়। কেননা কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে,

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]

“তোমরা তাদেরকে তালাক দিও তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১]

সুতরাং বুঝা গেল যে, অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন মহিলাকে রক্তস্রাবের অবস্থায় তালাক দেওয়া কুরআনে মাজীদের উক্ত আয়াতের বিরোধী। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দেওয়া কুরআনে কারীমের ঘোষণা বিরোধী নয়। কেননা যে ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিবে সে তো তার ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দিবে, (সে গর্ভাবস্থায়) স্ত্রী হায়েযে থাকুক বা পবিত্র থাকুক। কারণ, গর্ভধারণ দিয়েই তার ইদ্দত গণনা

করা হবে (গর্ভাবস্থায় আসা হায়েযের মাধ্যমে তিনি ইদ্দত গণনা করবেন না)। আর এ কারণেই সঙ্গমের পরে তাকে তালাক দেওয়া হারাম নয় বরং জায়েয। পক্ষান্তরে গর্ভবতী নয় এমন মহিলাকে সঙ্গমের পর তালাক দেওয়া হারাম।

২. গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে (গর্ভাবস্থায়) নারীর ঋতুর রক্ত চালু হওয়া না হওয়া সমান। প্রমাণ হিসেবে পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা তালাকের ৪নং আয়াত পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: ٤]

"গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়েয অবস্থায় আপতিত কিছু বিষয়

হায়েয অবস্থায় আপতিত বিষয়াদি কয়েক প্রকার:

১ম বিষয়: রক্তস্রাব নির্দিষ্ট নিয়ম ও পরিমাণের চেয়ে কম অথবা বেশি হওয়া। যেমন কোনো নারীর প্রতি মাসে ছয় দিন করে ঋতুস্রাবের অভ্যাস ছিল কিন্তু এক মাসে ৭ দিন পর্যন্ত ঋতুস্রাব অব্যাহত থাকে অথবা কোনো মেয়ে লোকের ৭ দিন করে ঋতুস্রাব হয়ে থাকে সেখানে ৬ দিন থাকার পর বন্ধ হয়ে গেল।

২য় বিষয়: নিয়মিত অভ্যাসের আগে-পরে হায়েয আরম্ভ হওয়া। যেমন, যেখানে মাসের শেষের দিকে হায়েয আসে সেখানে প্রথম দিকে আসলো অথবা মাসের প্রথম দিকে আসার পরিবর্তে শেষের দিকে আসলো।

উপরোক্ত বিষয় দু'টির হুকুম কী? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক সমাধান হচ্ছে, নারী যখনই ঋতুস্রাব দেখতে পাবে তখনই ঋতুবতী হিসেবে গণ্য হবে এবং যখনই তা বন্ধ হবে তখনই পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে পূর্ব অভ্যাসের চেয়ে কম-বেশি হওয়া কিংবা আগে-পরে হওয়া সমান কথা। এ মাসআলার প্রমাণাদি পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ হলো, রক্তস্রাব দেখা দেওয়া না দেওয়ার ওপরই তার হুকুম-আহকাম নির্ভর করে। এটিই ইমাম শাফেঈ রহ.-এর অভিমত। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ.-ও এ সমাধানকে গ্রহণ করেছেন। মুগনী গ্রন্থের লেখক উক্ত অভিমতের সমর্থন করে বলেছেন , 'উল্লিখিত

অবস্থায় যদি নারীদের নিয়মিত বা পূর্ব অভ্যাস ধর্তব্য হতো তাহলে নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের কাছে তা বর্ণনা করতেন, বিলম্ব করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণসহ সকল নারী জাতির জন্য মাসআলাটির বিবরণ সার্বক্ষনিক প্রয়োজনীয় ছিল, তাই তাতে বিলম্ব করা জায়েয ছিল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অসতর্ক ছিলেন না, বরং সতর্কই ছিলেন। সুতরাং মুস্তাহাযাহ নারী ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে পূর্ব অভ্যাস ধর্তব্য বলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো আলোচনার সূত্রপাত হয় নি।’[4]

তৃতীয় বিষয়: হলুদ অথবা মাটি বর্ণের রক্ত প্রসঙ্গ:

কোনো মহিলা যদি তার লজ্জাস্থানে জখমের পানির মতো হলুদ বর্ণের অথবা হলুদ এবং কাল রং এর মধ্যবর্তী বর্ণের রক্ত দেখে তাহলে সে রক্ত ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে অথবা ঋতুস্রাবের পর পরই পবিত্র হওয়ার পূর্বে প্রবাহিত হলে ঋতুস্রাব বলে গণ্য হবে এবং এর ওপর ঋতুস্রাবের বিধি-বিধান কার্যকরী হবে। পক্ষান্তরে যদি সে রক্ত পবিত্রতা অর্জনের পরে প্রবাহিত হয়ে থাকে তাহলে সেটা ঋতুস্রাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা উম্মে আতিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

«كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»

---

[4] মুগনী: ১/৩৫৩।

“আমরা পবিত্রতা অর্জন করার পর হলুদ অথবা মাটিবর্ণের রক্তকে কিছুই মনে করতাম না।”[5]

সহীহ বুখারীর শরাহ (ব্যাখ্যা) ফতহুল বারীতে বলা হয়েছে যে, এই শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء “সাদা পানি না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করো না।” এবং উম্মে আতিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহার উল্লিখিত হাদীসে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে যদি হলুদ অথবা মাটিবর্ণের রক্ত দেখে তাহলে সেটা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং উম্মে আতিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের অর্থ হচ্ছে যে, ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে পবিত্রতা অর্জন করার পর হলুদ অথবা মাটি বর্ণের রক্ত দেখা দিলে তা ধর্তব্য নয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার যে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার প্রকৃত বিষয়বস্তু এই যে, তখনকার নারীরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার খিদমতে দারাজাহ (এমন জিনিস যা দ্বারা নারী তার লজ্জাস্থান আবৃত করে রাখে) পাঠাতেন, যেন তারা বুঝতে পারে যে, সেখানে ঋতুস্রাবের কোনো চিহ্ন বাকী আছে কি না? সে দারাজাহ’তে হায়েযের

---

[5] হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম বুখারীও বর্ণনা করেছেন তবে ‘পবিত্রতা অর্জন করার পর’ কথাটি তিনি উল্লেখ না করলেও শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন এভাবে ‘রক্তস্রাব বিহীন দিনগুলোতে হলুদ অথবা মাটিবর্ণের রক্ত প্রবাহিত হওয়া অধ্যায়’।

নেকড়া বা তুলা ছিল এবং উক্ত নেকড়ায় হলুদ রং দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন: 'তোমরা সাদা পানি না দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে বর্ণিত 'আল-কাস্সাতুল বাইযা' বলা হয় সেই সাদা পানিকে যা হায়েয বন্ধ হওয়ার সময় মহিলার গর্ভাশয় থেকে বের হয়।

৪র্থ বিষয়: ঋতুস্রাব থেমে থেমে প্রবাহিত হওয়া, যেমন একদিন প্রবাহিত হয় আর একদিন বন্ধ থাকে। এমতাবস্থায় দেখতে হবে এ ধরনের ব্যতিক্রম সব সময়ই হয় না মাঝে মধ্যে।

প্রথম অবস্থা: যদি সব সময়ই হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে ইস্তেহাযাহ হিসেবে গণ্য করে তার বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: আর যদি সব সময় এমন না হয়, বরং মাঝে মধ্যে এ ধরনের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে তাহলে যে সময়টুকুতে বা যে দিনটিতে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে সেটাকে পবিত্রতার মধ্যে গণ্য করা হবে? না ঋতুস্রাবের অন্তর্ভুক্ত করা হবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী রহ.র দুই অভিমতের বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে , এ ক্ষেত্রে স্রাব বিহীন মধ্যবর্তী ঐ সময়টুকুও হায়েযের মধ্যেই গণ্য করা হবে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এবং 'আল-ফায়েক' নামক গ্রন্থের লেখক উক্ত অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমতও তাই। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাদা পানি বের না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অথচ মধ্যবর্তী সেই সময়ে সাদা পানি দেখা যায় নি।

তাছাড়া যদি স্রাববিহীন মধ্যবর্তী সেই সময়টাকে পবিত্রতার মধ্যে গণ্য করা হয় তাহলে নিশ্চয় তার আগের এবং পরের সময়টাকে হায়েযের মধ্যে গণ্য করতে হবে অথচ এমন কথা কেউই বলে নি। আর যদি মধ্যবর্তী ঐ সময়টুকুকে পবিত্রতার হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে তালাকপ্রাপ্তা এবং বিধবা স্ত্রীদের ইদ্দতকাল ৫ দিনেই শেষ হয়ে যাবে। এমনিভাবে প্রতি দুই দিনে গোসল করা ইত্যাদি বিবিধ কারণে নারী জাতির জন্য বিষয়টি অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে অথচ ইসলামী শরী'আতে (আলহামদুলিল্লাহ) কষ্টকর বলতে কোনো কিছুই নেই।

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, বর্ণিত অবস্থায় রক্ত দেখা দিলে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং পরিচ্ছন্নতা দেখা দিলে তা পবিত্রতা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু রক্ত এবং পরিচ্ছন্নতার সমষ্টি যদি নিয়মিত হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে তাহলে অতিক্রমকারী রক্ত ইস্তেহাযাহ হিসেবে গণ্য হবে।

মুগনী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে , 'লক্ষ্য রাখতে হবে রক্ত যদি এক দিনের চেয়ে কম সময় বন্ধ থাকে তাহলে ঐ সময়টাকে পবিত্রতার মধ্যে গণ্য করা হবে না, ঐ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে যা নিফাসের অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, এক দিনের চেয়ে কম সময়ের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং এটাই সঠিক সমাধান। কেননা রক্ত একবার প্রবাহিত হবে, একবার বন্ধ হবে, তাহলে এক ঘন্টা পর পর পবিত্রতা অর্জনকারীনী মহিলার পক্ষে গোসল করা চরম কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অথচ শরী'আতের বিধি-বিধানে

কষ্টের কোনো স্থান নেই। যেমন, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হাজের ৭৮ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন ,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]

“তিনি দীনের মধ্যে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেন নি।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৮]

আল-মুগনী গ্রন্থের লেখক বলেন, সুতরাং এক দিনের কম সময় যদি রক্ত বন্ধ থাকে তাহলে তা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে পবিত্রতার ওপর কোনো প্রমাণ থাকলে সেটা পৃথক কথা। যেমন একজন নারীর নিয়মিত অভ্যাসের শেষ প্রান্তে এসে হায়েয বন্ধ হলো অথবা হায়েয বন্ধ হওয়ার পর মহিলা লজ্জাস্থানে ‘কাস্সায়ে বায়যা’ অর্থাৎ সাদা পানির রেখা দেখল তাহলে এমতাবস্থায় তা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত হবে।’ আল-মুগনী গ্রন্থের এই অভিমত উপরোক্ত দুই সমাধানের মধ্যবর্তী এক উত্তম অভিমত। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

৫ম বিষয়: রক্ত শুকিয়ে যাওয়া, যেমন মহিলা শুধু ভেজা ভেজা অবস্থা দেখতে পেল। এমতাবস্থাটি যদি হায়েযের মাঝামাঝিতে বা হায়েযের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পবিত্র হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়, তবে সেটাকে হায়েয হিসেবে গণ্য করতে হবে। আর যদি পবিত্র অবস্থা বিরাজ করার পর সেটা দেখা দেয় তবে সেটা আর হায়েয হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং তখন সেটার সর্বোচ্চ অবস্থা হচ্ছে তা হলুদ অথবা মাটি বর্ণের রক্তের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং সেগুলোর বিধান গ্রহণ করবে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

হায়েযের বিধি-বিধান

হায়েযের বিশটিরও অধিক হুকুম রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. সালাত: ঋতুবতী মহিলার জন্য ফরয হোক কিংবা নফল, সকল প্রকার সালাত পড়া নিষিদ্ধ। যদি পড়া হয় তাহলে সে সালাত শুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে ঋতুবতী মহিলার জন্য সালাত ফরযও নয়। তবে পবিত্র হওয়ার পর অথবা ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পূর্বে কোনো ওয়াক্তের পূর্ণ এক রাকাত পড়তে পারে এতটুকু সময় যদি পেয়ে যায় তাহলে উক্ত ওয়াক্তের সালাত কাযা করা ফরয। এক্ষেত্রে সে সময়টুকু ওয়াক্তের প্রথম দিক হোক অথবা শেষ দিক, এতে কোনো পার্থক্য নেই।

ওয়াক্তের প্রথম দিকে এক রাকাত পরিমাণ সময় পাওয়ার দৃষ্টান্ত: একজন নারী সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর এক রাকাত পড়তে পারে এতটুকু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঋতুবতী হলো, তাহলে হায়েয বন্ধ হওয়ার পর মাগরিবের এ সালাতটি কাযা করা তার ওপর ফরয। কেননা সে ঋতুবতী হওয়ার পূর্বে মাগরিবের ওয়াক্ত থেকে এক রাকাত সমপরিমাণ সময় পেয়েছে।

ওয়াক্তের শেষ দিকে এক রাকাত সময় পাওয়ার দৃষ্টান্ত: একজন নারী সূর্যোদয়ের পূর্বে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়েছে এবং তখনও ফজরের এক রাকাত আদায় করতে পারে এতটুকু সময় বাকী রয়েছে তাহলে পবিত্র হওয়ার পর সেই ফজরের সালাত কাযা করা তার ওপর ফরয।

কেননা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর সে ফজরের ওয়াক্ত থেকে এক রাকাতের সমপরিমাণ সময় পেয়েছে।

পক্ষান্তরে ঋতুবতী মহিলা যদি সালাতের ওয়াক্ত থেকে এতটুকু সময় না পায় যার মধ্যে এক রাকাত সালাত পড়া যেতে পারে, যেমন প্রথম দৃষ্টান্তে সূর্যাস্তের পর এক মিনিটের মধ্যেই মহিলা ঋতুবতী হয়ে গেল অথবা ২য় দৃষ্টান্তে সূর্যোদয়ের পূর্বে মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই ঋতু থেকে পবিত্র হলো, তাহলে উক্ত মহিলার ওপর সেই ওয়াক্তের সালাত কাযা করা ওয়াজিব হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ»

“যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকাত পেয়েছে সে পুরো সালাতই পেয়েছে বলে মনে করতে হবে।”[6] এর মাফহূম তথা বুঝ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি সালাতের এক রাকাতের চেয়েও কম অংশ পায় তাহলে পুরো সালাত পেয়েছে বলে মনে করা যাবে না।

কিন্তু কোনো ঋতুবতী মহিলা যদি আসরের সময় থেকে এক রাকাতের সমপরিমাণ সময় পেয়ে যায় তাহলে তার ওপর আসরের সাথে যোহরের সালাতেরও কি কাযা করা ফরয? এমনিভাবে এশার ওয়াক্ত থেকে এক রাকাত পড়তে পারে এতটুকু সময় যদি পেয়ে যায় তাহলে তার জন্য কি এশার সালাতের সাথে মাগরিবের সালাতেরও কাযা করা জরুরী? এ

---

[6] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে শুধুমাত্র যে ওয়াক্তের এক রাকাত পরিমাণ সময় পাওয়া যাবে সে ওয়াক্তেরই সালাতের কাযা করা ফরয। আর তা হচ্ছে শুধু আসর এবং এশা, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত সালাত পেয়েছে সে আসরের সালাতকে পেয়েছে।”[7]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, সে যোহর এবং আসর পেয়েছে। একথাও উল্লেখ করেন নি যে, তার ওপর যোহরের সালাতের কাযা ফরয। আর শরী‘আতের মূলনীতি হচ্ছে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া (যতক্ষণ না দায়িত্বে বর্তানোর দলীল পাওয়া যাবে)। এটা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রাহিমাহুমাল্লাহর মাযহাব।[8]

ঋতুবতী মহিলার যিকর করা, তাকবীর বলা, তাসবীহ পাঠ করা, আল্লাহর প্রশংসা করা, খাওয়া-দাওয়াসহ যে কোনো কাজে বিসমিল্লাহ বলা, হাদীস পাঠ করা, দো‘আ করা, দো‘আয় আমীন বলা এবং কুরআন শরীফ শ্রবণ করা ইত্যাদি কোনোটাই হারাম নয়। কেননা সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে,

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ».

---

[7] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[8] শারহুল মুহায্যাব: ৩/৭০।

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার রক্তস্রাব চলাকালীন তার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।”

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উম্মে আতিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, “স্বাধীন নারী, পর্দানশীন ও ঋতুবতী মহিলারা দুই ঈদের সালাতের জন্য ঈদগাহে যেতে পারবে এবং তারা ধর্মীয় আলোচনা ও মুমিনগণের দো‘আয় উপস্থিত হতে পারবে। তবে ঋতুবতী নারীরা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে।”

ঋতুবতী মহিলার স্বয়ং কুরআন তিলাওয়াত করার হুকুম:

বেশিরভাগ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ঋতুবতী মহিলার পক্ষে উচ্চারণ করে কুরআন তিলাওয়াত করা নাজায়েয এবং নিষিদ্ধ। তবে যদি শুধু চোখ দিয়ে দেখে অথবা মুখ দিয়ে উচ্চারণ ব্যতীত শুধু মনে মনে পড়ে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, কুরআন শরীফ চোখের সামনে আছে অথবা কুরআন মাজীদের আয়াত সম্বলিত কোনো বোর্ড সামনে আছে। এমতাবস্থায় ঋতুবতী নারী যদি আয়াতগুলোর দিকে তাকায় এবং মনে মনে পড়ে তাহলে এটা জায়েয হওয়ার পিছনে কারো কোনো দ্বিমত নেই বলে ইমাম নাওয়াওয়ী শারহুল মুহায্যাব ২য় খণ্ডের ৩৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী, ইবন জারীর তাবারী এবং ইবনুল মুনযির বলেছেন, এটা জায়েয। ফাতহুল বারী ১ম খণ্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ইমাম মালেক ও ইমাম

শাফেঈর (পুরাতন অভিমতের) উদ্ধৃতি দিয়ে এবং বুখারী শরীফে ইবরাহীম নাখ'ঈর উদ্ধৃতি পেশ করে বলা হয়েছে যে, ঋতুবতী নারীর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. (ফাতাওয়া গ্রন্থে মাজমূআ ইবন কাসেম ২৬তম খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায়) বলেন, 'ঋতুবতী নারীর পক্ষে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ, এ ব্যাপারে কোনোই প্রমাণ নেই। কেননা 'ঋতুবতী নারী এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন শরীফ থেকে কিছুই পড়তে পারবে না" বলে যে হাদীসটি রয়েছে তা হাদীস বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্বল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও নারীদের রক্তস্রাব আসতো। এখন যদি এই রক্তস্রাবের কারণে সালাতের মতো কুরআন শরীফের তিলাওয়াতও তাদের জন্য হারাম হয়ে থাকতো তাহলে নিশ্চয় সাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে তা বর্ণনা করতেন এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দিতেন এবং কেউ না কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত হারাম প্রসঙ্গে কেউই কোনো কিছু বর্ণনা করেন নি। সুতরাং কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যেখানে সে ক্ষেত্রে হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতকে হারাম হিসেবে গণ্য করা জায়েয হবে না। আর যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীদের হায়েয হওয়া সত্বেও তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেন নি। তাই সাব্যস্ত হলো যে, আসলে তা হারাম নয়।'

এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এখন এটিই বলা উচিৎ হবে যে, ঋতুবতী নারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া উচ্চারণ করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত না করাই উত্তম। তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে যেমন, শিক্ষিকা নারী ছাত্রীদেরকে শিখানোর উদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারণ করে কুরআন শরীফ পড়তেই হবে। এমনিভাবে পরীক্ষার্থীনী পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে হায়েয অবস্থায়ও কুরআন শরীফ পড়তে পারবে।

২. সাওম: ঋতুবতী নারীর পক্ষে ফরয-নফল সর্ব প্রকার সাওম রাখা হারাম এবং সাওম রাখাও তার জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু ফরয সাওমের কাযা তার ওপর ওয়াজিব। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ, تَعْنِيْ الْحَيْضَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»

“আমাদের যখন রক্তস্রাব হতো তখন আমাদেরকে শুধু সাওমের কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো। কিন্তু সালাতের কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো না।”[9]

সাওম অবস্থায় রক্তস্রাব আসলে তাহলে সাওম নষ্ট হয়ে যায়। যদিও রক্তস্রাব সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে এসে থাকে। তবে ঐ সাওমটি ফরয হয়ে থাকলে তার কাযা ওয়াজিব। কিন্তু সাওম পালনকারীনী মহিলা যদি সাওম অবস্থায় সূর্যাস্তের পূর্বে লজ্জাস্থানের বেদনা অনুভব করে এবং

[9] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

প্রকৃতপক্ষে রক্তস্রাব সূর্যাস্তের পরেই আরম্ভ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত নারীর সাওম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে সাওম নষ্ট হবে না। কারণ পেটের অভ্যন্তরের রক্তের কোনো হুকুম নেই। এর প্রমাণ, পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয় এমন একজন মহিলা সম্পর্কে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো যে, "তার ওপর কি গোসল করা ফরয? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, যদি সে বীর্য দেখতে পায়।" উক্ত হাদীসে গোসল ফরয হবে কি না এ হুকুমটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য দেখা ও না দেখার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। এমনিভাবে বের না হওয়া পর্যন্ত বা দেখা না দেওয়া পর্যন্ত হায়েযেরও বিধি-বিধান কার্যকরী হবে না, বরং কার্যকরী তখনই হবে যখন রক্ত দেখা দিবে।

হায়েয অবস্থায় ফজরের সময় শুরু হলে ঐ দিনের সাওম রাখা জায়েয নয়। যদিও ফজরের সামান্য সময় পরে পবিত্র হয়ে থাকে। আর যদি ফজরের একটু আগে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ হওয়ার পর সাওম রাখে তাহলে তা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় গোসল ফজরের পরে করলেও কোনো দোষ নেই। যেমন, বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি যদি অপবিত্রাবস্থায় সাওমের নিয়ত করে এবং গোসল ফজরের পরে করে তাতে কোনো দোষ নেই। তার সাওম শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত স্পষ্ট হাদীস রয়েছে:

«انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ فِيْ رَمَضَانَ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদোষ ব্যতীত স্ত্রী সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ভোরে উঠে রমাযানের সাওম রাখতেন।”[10]

৩. বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ: ঋতুবতী নারীর জন্য বাইতুল্লাহ শরীফের ফরয ও নফল উভয় প্রকার তাওয়াফ করা হারাম। যদি করা হয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর সাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন:

«افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

“পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি কা‘বা শরীফের তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্যান্য কাজগুলো করে যাও।” এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েয অবস্থায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। বুঝা গেল, রক্তস্রাব অবস্থায় কা‘বা শরীফের তাওয়াফ করা হারাম। তবে হজ ও উমরার অন্যান্য কাজ যেমন সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌঁড়ানো, ‘আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রি যাপন করা এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি হারাম নয়। এ থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যদি কোনো মহিলা পবিত্রাবস্থায় তাওয়াফ করে এবং তাওয়াফ শেষ হওয়া মাত্রই

[10] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

হায়েয শুরু হলো অথবা সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌঁড়ানোর সময় হায়েয দেখা দিল তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

৪. ঋতুবতী নারীর জন্য বিদায়ী তওয়াফ জরুরী নয়: হজ ও উমরার করণীয় কাজগুলো শেষ করে নিজের দেশের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে যদি কোনো মহিলার রক্তস্রাব আরম্ভ হয়ে যায় এবং রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তাহলে বিদায়ী তওয়াফ করা থেকে উক্ত মহিলা মুক্তি পেয়ে যাবে অর্থাৎ বিদায়ী তওয়াফ আর করা লাগবে না। কেননা এ প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন,

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»

"(সকল হজকারী)-কে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের শেষ কাজ যেন কা'বা শরীফের তাওয়াফ দিয়েই হয়। কিন্তু ঋতুবর্তী নারীর জন্য এই আদেশ শিথিল করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সেই বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে না।"[11]

প্রকাশ থাকে যে, ঋতুবতী নারীর জন্য বিদায়ের প্রাক্কালে মসজিদে হারামের দরজায় গিয়ে মোনাজাত বা প্রার্থনা করা উচিৎ নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়ার ওপরই সমস্ত ইবাদতের মূল ভিত্তি। শুধু তাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু

[11] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস এই হুকুমের বিরোধিতা করে। যেমনটি সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত। সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার তাওয়াফে যিয়ারার (ফরয তাওয়াফ) পর যখন ঋতুস্রাব দেখা দিল তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: "এখন তাহলে মদীনার দিকে বের হয়ে পড়"। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদের দরজার দিকে যাওয়ার জন্য আদেশ দেননি। যদি বিষয়টি শরী'আতসম্মত হতো তাহলে নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বর্ণনা করতেন। তবে হজ ও উমরার ফরয তাওয়াফ থেকে ঋতুবতী নারী অব্যাহতি পাবে না, বরং পবিত্রতা অর্জন করার পর তাকে ফরয তাওয়াফ করতেই হবে।

৫. মসজিদে ঋতুবতী নারীর অবস্থান: ঋতুবতী নারীর মসজিদে এমনকি ঈদগাহে সালাতের স্থানে অবস্থান করা হারাম। এ প্রসঙ্গে উম্মে আতিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যায়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

«لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ وفِيه: يَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى»

"স্বাধীন, পর্দানশীন ও ঋতুবতী নারীরা যেন বের হয়। হাদীসে এও উল্লেখ আছে: ঋতুবতী নারীরা সালাতের স্থান থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে।"

৬. স্ত্রী সহবাস: রক্তস্রাব চলাকালীন স্ত্রী সহবাস করা স্বামীর জন্য যেমন হারাম ঠিক তেমনি ঐ অবস্থায় স্বামীকে মিলনের সুযোগ দেওয়াও স্ত্রীর

জন্য হারাম। এ হুকুমটি সরাসরি পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

“তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বলে দাও যে, এটা কদর্য বস্তু, কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাক এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকট যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২২]

উক্ত আয়াতে (মাহীয) শব্দ দ্বারা হায়েযের সময় এবং লজ্জাস্থানকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে হাদীস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “স্ত্রী সহবাস ছাড়া বাকী সব কিছু করতে পার।”[12]

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্তস্রাব অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম একমত। এখানে কারো কোনো রকম দ্বিমত নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য এমন একটি অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়া কোনোভাবেই বৈধ হবে না, যার ওপর কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর পরও যারা এ অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে তারা আল্লাহ ও

[12] সহীহ মুসলিম।

তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং মুমিনদের মতাদর্শের পরিপন্থী পথের অনুসারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব ২য় খণ্ডের ৩৭ নং পৃষ্ঠায় ইমাম শাফেঈ রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, ঋতুস্রাব চলাকালে যে ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হবে তার কবীরা গুনাহ হবে। আমাদের ওলামায়ে কেরাম যেমন ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলেছেন: যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলনকে হালাল মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি পুরুষের জন্য ঋতুস্রাব চলাকালীন সঙ্গম ব্যতীত স্ত্রীর সাথে এমন সব কাজ করাকে জায়েয করে দিয়েছেন যার মাধ্যমে স্বামী আপন কামোত্তেজনা নির্বাপিত করতে পারে। যেমন, চুমু দেওয়া, আলিঙ্গন করা এবং লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করা। তবে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ ব্যবহার না করাই উত্তম। কাপড় বা পর্দা জড়িয়ে আড়াল করে নিলে অসুবিধা নেই। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুস্রাব চলাকালীন আমাকে আদেশ করলে আমি ইযার পরতাম। তখন তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন।"

৭. তালাক: হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য হারাম। কেননা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা তালাকের ১ম আয়াতে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]

“হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১]

অর্থাৎ এমন সময়ে তালাক দিবে যার মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন তালাকের পর থেকে নির্দিষ্ট ইদ্দত গণনা করতে পারে। আর এটা গর্ভবতী অবস্থায় অথবা সঙ্গমবিহীন পবিত্রতার সময়ে তালাক দেওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, রক্তস্রাবের অবস্থায় তালাক দেওয়া হলে স্ত্রী ইদ্দত গণনা করতে পারবে না বরং অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কেননা যে হায়েযের মধ্যে তাকে তালাক দেওয়া হয়েছে সেটা তো ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে না। এমনিভাবে যদি পবিত্রতার অবস্থায় সঙ্গমের পর তালাক দেওয়া হয় তখনও ইদ্দতকাল নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে না। কেননা এই সঙ্গমের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণ অজানা থাকবে। যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকে তাহলে হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত গণনা করবে। এমতাবস্থায় যেহেতু ইদ্দতের প্রকার সম্পর্কে কোনো কিছু নিশ্চিত জানা নেই সেহেতু বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তালাক দেওয়া হারাম।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম প্রমাণিত হয়েছে এবং বুখারী ও মুসলিমসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও এটিই প্রতীয়মান হয়। যেমন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের অবস্থায় তালাক দিলে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে সে বিষয়ে অবহিত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন:

«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمُسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

“তুমি তাকে আদেশ কর সে যেন তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে নিয়ে আসে এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখে। অতঃপর পুনরায় যখন ঋতুস্রাব দেখা দিবে এবং সেই ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন নিজের নিকট রাখতে চাইলে রাখবে এবং তালাক দিতে চাইলে সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিবে। আর এটাই হচ্ছে সেই ইদ্দত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তালাক দেওয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন।”

যদি কোনো স্বামী ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং এর জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওবা করতঃ স্ত্রীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে পরবর্তীতে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের হুকুম মোতাবেক তালাক দিতে পারে। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার পর যে হায়েযে তালাক দেওয়া হয়েছে সে হায়েয থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছেই রাখবে। অতঃপর পুনরায় যখন রক্তস্রাব দেখা দিবে এবং তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন চাইলে তাকে স্ত্রী হিসেবে নিজের কাছে রেখেও দিতে পারবে আবার তালাক দিতে চাইলে সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিতে হবে। প্রকাশ থাকে যে,

রক্তস্রাব অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে তা জায়েয আছে:

প্রথম: বিবাহের পর স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নির্জন স্থানে একাকীভাবে একত্রিত হওয়ার পূর্বেই অথবা বিবাহের পর সহবাসের পূর্বেই রক্তস্রাবের অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তা হারাম নয়। কেননা এমতাবস্থায় স্ত্রীর ওপর কোনো ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তালাক প্রদান করা আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী হবে না।

দ্বিতীয়: রক্তস্রাব যদি গর্ভবতী অবস্থায় দেখা দেয় তাহলে তালাক প্রদান করা হারাম নয়।

তৃতীয়: তালাক যদি কোনো কিছুর বিনিময়ে দেওয়া হয় তাহলে হায়েয অবস্থায়ও তালাক দেওয়া জায়েয। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ এবং খারাপ সম্পর্ক বিরাজ করলে স্বামী বিনিময় নিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, যদিও স্ত্রী রক্তস্রাবের অবস্থায় থাকে। প্রমাণস্বরূপ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস উপস্থাপন করা যায়:

«أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ﵁ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟,, قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»

“সাবেত ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামীর

চরিত্র এবং ধর্ম সম্পর্কে আমি কোনো রকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি না। তবে ইসলামের মধ্যে কুফুরীকে আমি অপছন্দ করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দিতে পারবে? উত্তরে মহিলা বললেন: জি হ্যাঁ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন: তুমি বাগানটি নিয়ে তাকে তালাক দিয়ে দাও।”[13]

স্ত্রী রক্তস্রাব অবস্থায় আছে না পবিত্র অবস্থায়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিনিময় নিয়ে তালাক দেওয়া জায়েয আছে যদিও স্ত্রী হায়েয অবস্থায় থাকে।

দ্বিতীয়ত: এই তালাক তো অর্থের বিনিময়ে স্বামী থেকে স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা পথ মাত্র। সুতরাং যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো অবস্থাতে প্রয়োজন দেখা দিলে এ ধরনের তালাক দেওয়া জায়েয।

মুগনী গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে ৫২ পৃষ্ঠায় ‘খোলা’ অর্থাৎ ঋতুস্রাবগ্রস্ত স্ত্রীর পক্ষে অর্থের বিনিময়ে স্বামী থেকে তালাক নেওয়া জায়েয হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষতি থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্যই হায়েয চলাকালে তালাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তাকে ইদ্দতকাল দীর্ঘ হলে। আর অর্থ নিয়ে তালাক নেওয়ার বিধানটিও ক্ষতির সম্মুখীন যাতে না হতে হয় সে উদ্দেশ্যেই

---

[13] সহীহ বুখারী।

শরী'আত কর্তৃক বিধিত হয়েছে। ক্ষতি বলতে যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য অথবা স্ত্রীর স্বামীকে অপছন্দ করা, তাকে ঘৃণা করা এবং তার সাথে সংসার করতে অনীহা প্রকাশ করা। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ অবস্থার সৃষ্টি হলে মূলত এটা স্ত্রীর জন্য ইদ্দতকাল দীর্ঘ হওয়ার চেয়েও বড় সমস্যা। সুতরাং সামান্য ক্ষতি হলেও বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রক্তস্রাবের অবস্থায়ও বিনিময় দিয়ে তালাক নেওয়া জায়েয এবং এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থের বিনিময়ে তালাক গ্রহণকারী উক্ত মহিলার অবস্থা সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি।

হায়েয অবস্থায় নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা প্রতিটি জিনিসের হালাল হওয়াটাই হচ্ছে প্রকৃত নিয়ম এবং শরী'আতের দিক দিয়ে এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো প্রমাণও নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, হায়েয অবস্থায় স্বামীকে স্ত্রীর নিকট যেতে দেওয়া যাবে কি না? উত্তরে বলতে হবে, যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে স্বামী সঙ্গম থেকে বিরত থাকবে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যথায় সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে পবিত্র হওয়ার আগে স্বামীকে স্ত্রীর নিকট পাঠানো যাবে না বা যেতে দেওয়া হবে না।

৮. হায়েযের মাধ্যমে তালাকের ইদ্দত গণনা করা:

কোনো পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পর অথবা নির্জন স্থানে একত্রিত হওয়ার পর তালাক দেয় তাহলে পূর্ণ তিন হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দতকাল গণনা করা তালাকপ্রাপ্তা নারীর ওপর ফরয। তবে শর্ত হচ্ছে

উক্ত স্ত্রীকে ঋতুবতী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং অন্তঃসত্ত্বা হবে না। প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার ঘোষণা:

﴿ٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

“তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৮]

আর যদি তালাকপ্রাপ্তা নারী অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলে তার ইদ্দতকাল হবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। কেননা আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]

“গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৪]

আর যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ঋতুবতী নারীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, যেমন কম বয়স্কা, যার রক্তস্রাব এখনো আরম্ভ হয়নি বা অতিবয়স্কা নারী যার বয়োঃবৃদ্ধির কারণে হায়েয আসার সম্ভাবনা নেই অথবা অস্ত্রোপচার জনিত কারণে গর্ভাশয় নষ্ট হওয়ায় হায়েয আসছে না -ইত্যাদি কারণে যে সকল মহিলার রক্তস্রাবের সম্ভাবনা নেই তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ তিন মাস। প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:4]

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদেরকে নিয়ে সন্দেহ হলে (হায়েয দ্বারা ইদ্দত গণনা সম্ভব না হলে) তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস। এমনিভাবে যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছে নি তাদের ইদ্দতকালও অনুরূপ হবে।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৪]

ঋতুবতী নারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও যে সমস্ত মহিলার নির্দিষ্ট কোনো কারণে যেমন অসুস্থতা বা দুগ্ধ পান করানোর ফলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হায়েয আসে না তারা ইদ্দতের মধ্যেই পড়ে থাকবে। যদিও ইদ্দতকাল দীর্ঘ হয়ে যায়। অতঃপর যখন রক্তস্রাব আরম্ভ হবে তখন ইদ্দত গণনা শুরু করবে। আর যদি নির্দিষ্ট কারণটি শেষ হওয়ার পরেও রক্তস্রাব না আসে যেমন রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেছে অথবা দুধ পান করানো শেষ হয়ে গিয়েছে অথচ হায়েয বন্ধই রয়েছে তাহলে কারণটি শেষ হওয়ার পর থেকে পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালন করবে এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত, যা শরী‘আতের বিধান অনুসারে কার্যকরী হয়ে থাকে। কেননা নির্দিষ্ট কারণ শেষ হওয়ার পরেও হায়েয না আসা বিনা কারণে হায়েয বন্ধ থাকার মতই। আর কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া হায়েয বন্ধ থাকলে পূর্ণ এক বছর ইদ্দত পালন করতে হয়। তন্মধ্যে ৯ মাস গর্ভের কারণে সতর্কতাবশতঃ, আর তিন মাস ইদ্দতের কারণে।

যদি বিবাহের পর স্পর্শ করার অথবা স্বামী-স্ত্রী কোনো নির্জন স্থানে একাকীভাবে একত্রিত হওয়ার পূর্বেই তালাক দেওয়া হয় তাহলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আদৌ ইদ্দত পালন করতে হবে না, না হায়েযের

মাধ্যমে না অন্য কোনো পন্থায়। কারণ, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুমিন বান্দাদেরকে সম্মোধন করে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب : 49]

“হে মুমিনগণ! তোমরা মু‘মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর এবং স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪৯]

৯. হায়েযের মাধ্যমে গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত হওয়া সম্পর্কিত হুকুম:

গর্ভে ভ্রূণশূন্যতার সাথে শরী‘আতের কয়েকটি হুকুম সম্পৃক্ত। তন্মধ্যে যদি গর্ভাবস্থায় স্বামী মারা যায় তখন ঐ গর্ভজাত সন্তান তার উত্তরসূরী হবে। উক্ত মহিলাকে যদি পুনঃবিবাহ দেওয়া হয় স্বামী মহিলাটির ঋতুস্রাব অথবা গর্ভে সন্তান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করবে না। এখন যদি সে অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির সাথে সেই সন্তানটির উত্তরাধিকারের হুকুম দেওয়া হবে। কেননা তার মৃত্যুর সময় সন্তানের অস্তিত্ব গর্ভাশয়ে ছিল। আর যদি মহিলাটির ঋতুস্রাব হয় তখন (ভ্রূণ) পূর্ব স্বামীর ওয়ারিস হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা ঋতুস্রাব দ্বারা গর্ভাশয় ভ্রূণমুক্ত বলেই সর্বসম্মতিক্রমে বিবেচনা করা হয়।

১০. গোসল ওয়াজিব প্রসঙ্গ:

ঋতুবতী নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হলে গোসলের মাধ্যমে পুরো শরীরের পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশকে বলেছিলেন:

«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»

"সুতরাং যখন তোমার রক্তস্রাব আরম্ভ হবে তখন সালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন বন্ধ হবে তখন গোসল করে সালাত পড়বে।"[14]

ওয়াজিব গোসল সমাপনের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে পুরো দেহটাকে চুলের গোড়াসহ গোসলের মধ্যে শামিল করে নেওয়া। আর উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে হাদীসে বর্ণিত পন্থায় গোসল করা। জনৈকা আসমা বিনতে শাকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঋতুবতী মহিলার গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنَ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكَهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ, ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً أَيْ قِطْعَةَ قُمَاشٍ فِيْهَا مِسْكٌ فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: كَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِيْنَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِيْ ذَلِكَ تَتَّبِعِيْنَ أَثَرَ الدَّمِ».

"তোমরা বরইপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তমরূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাবে এবং সম্পূর্ণ শরীরে পানি ঢেলে দিবে।

[14] সহীহ বুখারী।

পরে কস্তুরী মাখানো এক টুকরা কাপড় দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করবে। একথা শুনে আসমা বললেন: কস্তুরী মাখানো বস্ত্র দ্বারা কীভাবে পবিত্রতা হাসিল করবো? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সুবহানাল্লাহ!। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা চুপিসারে তাকে বললেন: রক্তের চিহ্ন উক্ত কস্তুরী মিশ্রিত কাপড় দ্বারা ঘষে মুছে ফেলবে।”[15]

গোসলের সময় নারীদের মাথায় চুল বাঁধা থাকলে তা খোলা আবশ্যক নয়। তবে যদি এমন শক্তভাবে বাঁধা থাকে যে, চুলের গোড়ায় পানি না পৌঁছার আশঙ্কা থাকে তাহলে বন্ধন খোলা বাধ্যতামূলক। সহীহ মুসলিমে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত এক হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আমার মাথার চুল বেঁধে রাখি। এখন অপবিত্রতার গোসলের সময় (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ‘অপবিত্রতা ও হায়েযের গোসলের সময়’) আমি কি তা খুলে নিব? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«لاَ إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»

“না, বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার উপর তিন অঁজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে।”

---

[15] সহীহ বুখারী।

সালাতের ওয়াক্ত চলাকালে ঋতুস্রাব বন্ধ হলে ঋতুবতী মহিলার ওপর তাড়াতাড়ি গোসল করা অত্যাবশ্যক, যাতে উক্ত সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলা যদি সফরে থাকে এবং সঙ্গে পানি না থাকে অথবা সাথে পানি আছে কিন্তু ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে অথবা অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে তাহলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নিবে। এ অবস্থা চলতে থাকবে যতক্ষণ না বাধা দূরীভূত হবে, যখন বাধা দূরীভূত হবে তখন গোসল করবে।

কিছু কিছু মহিলা এমনও আছেন যারা সালাতের ওয়াক্তের মধ্যেই রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া সত্বেও গোসল করতে বিলম্ব করেন এবং এই বলে কারণ দেখিয়ে থাকেন যে এই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র হওয়া সম্ভব নয়। মূলত এটা কোনো দলীল বা ওযর হতে পারে না। কেননা ওয়াজিবের সর্বনিম্ন স্তর অনুসারে কোনো রকম গোসল সেরে ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা সম্পূর্ণ সম্ভব, অসম্ভবের কিছুই নেই। অতঃপর দীর্ঘ সময় পাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্রতা অর্জন করে নিতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইস্তেহাযা ও তার বিধান

ইস্তেহাযাহর সংজ্ঞা: কোনো নারীর যদি অনবরত এমনভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় যে কোনো সময়েই বন্ধ হয় না, অথবা খুব অল্প সময় যেমন মাসে এক কি দুই দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকে তাহলে উক্ত প্রবাহমান রক্তকে ইস্তেহাযাহ বলা হয়। এক সাথে এমনভাবে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দৃষ্টান্ত সহীহ বুখারীতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন,

«قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ لاَ أَطْهُرُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ».

“ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি পবিত্র হতে পারছি না। অন্য রেওয়ায়েতে আছে: আমার অবিরাম রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে যার ফলে আমি পবিত্রতা অর্জন করতে পারছি না।”

খুব অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হওয়ার দৃষ্টান্ত হামনাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে রয়েছে। তিনি এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক দীর্ঘ সময় ধরে আমার রক্তস্রাব হয়।[16]

---

[16] এই হাদীসখানা ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. হাদীসটিকে

মুস্তাহাযাহ তথা অস্বাভাবিক রক্তস্রাবে আক্রান্ত নারীর বিভিন্ন অবস্থা

অনবরত রক্ত প্রবাহিত হয় এমন নারীর অবস্থা তিন প্রকার:

১. ইস্তেহাযাহ অর্থাৎ অনবরত রক্ত প্রবাহ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তার প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋতুস্রাবের অভ্যাস ছিল। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে পূর্ব নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রবাহমান রক্তকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এর ওপর হায়েযের বিধি-বিধান কার্যকরী হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পরের রক্তস্রাবকে ইস্তেহাযাহ গণ্য করে তার নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। যেমন, একজন নারীর প্রতি মাসের প্রথম দিকে ছয় দিন করে রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এখন হঠাৎ করে দেখা গেল যে, ঐ নারীর অবিরাম রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তাহলে তখন প্রতি মাসের প্রথম ছয় দিনে প্রবাহিত রক্তকে হায়েয হিসেবে গণ্য করে বাকীটাকে ইস্তেহাযাহ হিসেবে ধরে নিতে হবে। কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হচ্ছে:

«أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيْ الصَّلاَةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِيْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ»

“ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অবিরাম

সহীহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারী রহ. হাসান হিসেবে মত ব্যক্ত করেছেন বলে বর্ণিত আছে।।

রক্তস্রাব হচ্ছে যার কারণে আমি পবিত্র হতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, এটি রগ থেকে বের হয়ে আসা রক্ত। তবে হ্যাঁ, সাধারণতঃ অন্যান্য মাসে যতদিন তুমি ঋতুবতী থাকতে ততদিন সালাত থেকে বিরত থাক তারপর গোসল করে সালাত আদায় কর।”[17]

আর সহীহ মুসলিমে আছে:

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: امْكُثِيْ قَدرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন: তুমি ঐ পরিমাণ সময় অপেক্ষা কর যে পরিমাণ সময় সাধারণতঃ ঋতুস্রাবে আক্রান্ত থাক। অতঃপর গোসল করে সালাত আদায় কর।”

এ থেকে বুঝা গেল যে, মুস্তাহাযাহ অর্থাৎ অবিরাম রক্তস্রাব হয় এমন নারী ঐ পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে এবং সালাত থেকে বিরত থাকবে যে পরিমাণ সময় সে সাধারণতঃ ঋতুস্রাবে আক্রান্ত থাকত। তারপর গোসল করে সালাত আদায় করতে থাকবে এবং রক্তের কারণে সালাত আদায়ে মনে কোনো রকম দ্বিধা রাখবে না।

[17] সহীহ বুখারী।

২. ইস্তেহাযাহ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আক্রান্ত নারীর ঋতুস্রাবের কোনো নির্দিষ্ট সময়-সীমা নেই। অর্থাৎ জীবনে এটাই তার প্রথম রক্তস্রাব। এমতাবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত রক্তে কালো বর্ণ অথবা গাঢ়তা কিংবা কোনো গন্ধ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েযের বিধি-বিধান কার্যকরী হবে। অন্যথায় ইস্তেহাযাহ হিসেবে গণ্য করে তার নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। যেমন, একজন নারী জীবনে প্রথম লজ্জাস্থানে রক্ত দেখলো এবং সে রক্তকে দশদিন পর্যন্ত কালো দেখেছে এবং মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে লাল দেখেছে। অথবা দশদিন পর্যন্ত গাঢ় ও ঘন ছিল এবং মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে পাতলা ছিল। অথবা দশদিন পর্যন্ত তার মধ্যে গন্ধ ছিল এবং তার পরে কোনো গন্ধই থাকে নাই, তাহলে প্রথম দৃষ্টান্তে প্রবাহমান রক্ত কালো বর্ণ থাকা পর্যন্ত, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে গাঢ়তা থাকা পর্যন্ত এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে গন্ধ থাকা পর্যন্ত হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং এর পর হতে ইস্তেহাযাহ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন:

«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»

“যখন হায়েযের রক্ত দেখা দিবে তখন তা কালো বর্ণের হবে যা চেনা যায়। সুতরাং কালো বর্ণের রক্ত দেখা দিলে সালাত থেকে বিরত থাক।

আর কালো ছাড়া অন্য কোনো বর্ণ দেখা দিলে অযু করে সালাত আদায় কর। কেননা তা রগ থেকে বের হয়ে আসা রক্ত।”[18]

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীসের সনদ ও মূল উদ্ধৃতিতে কিছু অসুবিধা থাকলেও ওলামায়ে কেরাম এর ওপর আমল করেছেন এবং অধিকাংশ নারী জাতির নিয়মিত অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করে হাদীসখানার ওপর আমল করাই উত্তম।

৩. মুস্তাহাযাহ নারীর পূর্বে ঋতুস্রাবের না কোনো নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে না ইস্তেহাযাহ ও হায়েযের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো চিহ্ন আছে। অর্থাৎ জীবনে এটাই তার প্রথম রক্তস্রাব এবং রক্ত একাধারে অবিরাম বের হচ্ছে। প্রবাহমান রক্ত পুরোটাই এক ধরনের অথবা বিভিন্ন রকমের যেটাকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় অধিকাংশ নারীর ঋতুস্রাবের সময়-সীমা অনুযায়ী আমল করতে হবে। অর্থাৎ অবিরাম রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে ছয় অথবা সাত দিন হায়েযের নিয়ম-নীতি কার্যকরী হবে। তারপর ইস্তেহাযার হুকুম পালন করতে হবে। যেমন, একজন মেয়ের মাসের ৫ তারিখে রক্ত প্রবাহ আরম্ভ হয়েছে এবং জীবনে এটাই তার প্রথম। রক্ত বিরতিহীনভাবে বের হচ্ছে এতে হায়েযের কোনো চিহ্ন নেই। রং ও গন্ধ ইত্যাদি দিয়ে পার্থক্য করারও কোনো সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় প্রতি মাসের ৫ তারিখ থেকে ছয় অথবা সাত দিন হায়েযের হুকুম পালন

[18] এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং ইবন হিব্বান ও হাকেম বিশুদ্ধ বলে মতামত দিয়েছেন।

করতে হবে। কারণ হামনাহ বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হয়ে বলেছিলেন:

«يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَرَى فِيْهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِيْ الصَّلاَةَ وَالصِّيَام فَقَالَ: أَنْعَتُ لَكِ أَصِفُ لَكِ اسْتِعْمَالَ الْكُرْسُفَ (وَهُوَ الْقُطْن) تَضَعِيْنَهُ عَلَى الْفَرْج فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيْهِ قَالَ: إِنَّمَا هَذَا رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيْضِيْ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِيْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ اغْتَسِلِيْ حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّيْ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُوْمِي»

“হে আল্লাহর রাসূল! আমার তো অনেক দীর্ঘ সময় ধরে খুব বেশি পরিমাণে রক্তস্রাব হচ্ছে। এ অবস্থায় আপনার মতামত কী? এটা তো আমার সালাত ও সাওম আদায়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমাকে যোনীতে তুলা ব্যবহার করার পর পরামর্শ দিচ্ছি, তুলা রক্ত টেনে নিবে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন যে, আমার প্রবাহিত রক্ত তার চেয়েও বেশি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটা শয়তানের একটা খোঁচা মাত্র। আপাততঃ তুমি ছয় অথবা সাত দিন হায়েযের হুকুম পালন করে চল। তারপর ভালো করে গোসল কর। যখন তুমি মনে করবে যে, তুমি

পবিত্রতা অর্জন করেছ তখন ২৪ দিন অথবা ২৩ দিন সালাত ও সাওম আদায় করতে থাক।”[19]

স্মরণ রাখতে হবে যে, উল্লিখিত হাদীসে ছয় অথবা সাত দিনের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এটাকে ইচ্ছামত গ্রহণ করবে। মূলত একটা সমাধান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ইজতিহাদ করে এরকম বলা হয়েছে। সুতরাং রক্তস্রাবে আক্রান্ত নারীর অবস্থা ও বয়স ইত্যাদির সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সংগতি রেখে হায়েযের সময় নির্দিষ্ট করবে তা যদি ছয় দিন হয় তাহলে ছয় দিন এবং সাত দিন হলে সাতই ধার্য করবে।

মুস্তাহাযার সদৃশ নারীর অবস্থার বিবরণ:

জরায়ূতে অথবা জরায়ূর আশে-পাশে অপারেশন করার কারণে যদি লজ্জাস্থান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে তখন দুই অবস্থায় দুই প্রকার হুকুম পালন করতে হবে:

১. এ ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অস্ত্রোপচারের পর আর কোনো ঋতুস্রাবের সম্ভাবনা নেই অথবা অপারেশনের মাধ্যমে এমনভাবে গর্ভাশয়ের পথকে বন্ধ করা হয়েছে যে, আর কোনো প্রকার রক্ত সেখান থেকে বের হবে না, তাহলে এই নারীর ক্ষেত্রে মুস্তাহাযার হুকুম প্রযোজ্য হবে না এবং তার হুকুম ঐ মহিলার হুকুমের মতো হবে যে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর পুনরায় লজ্জাস্থানে হলুদ অথবা মাটি বর্ণের

[19] হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ সহীহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাসান বলেছেন।

রক্ত অথবা স্যাঁতসেঁতে কিছু দেখতে পেল। সুতরাং এমতাবস্থায় সালাত-সাওম ছেড়ে দেবে না, সহবাসও নিষিদ্ধ নয় এবং এ রক্তের কারণে গোসল করাও ওয়াজিব নয়। তবে সালাতের সময় রক্তটাকে পরিষ্কার করা এবং কাপড়ের কোনো টুকরা দিয়ে লজ্জাস্থানে পট্টি বাঁধা আবশ্যক যেন রক্ত বের হতে না পারে। অতঃপর সালাতের অযু করবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, উল্লিখিত অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পরেই অযু করবে, আর নফল সালাতের ক্ষেত্রে সালাতের ইচ্ছা করার সময় অযু করবে।

২. অস্ত্রোপচারের পর আর ঋতুস্রাব আসবে না এ ব্যাপারে যদি নিশ্চয়তা না থাকে বরং আসারই সম্ভাবনা থাকে তাহলে মুস্তাহাযাহ নারীর মতো হুকুম পালন করতে হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছিলেন:

«إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْق وَلَيْسَ بِالْحَيْضَة فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِيْ الصَّلاَةَ»

“এটি হায়েয নয় বরং একটি শিরা নিসৃত রক্ত। সুতরাং যখন হায়েয আসবে তখন সালাত থেকে বিরত থাক।”

এ থেকে সাব্যস্ত হলো যে, মুস্তাহাযাহ নারীর হুকুম কেবলমাত্র সেই মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যার ঋতুস্রাব হওয়ার বা বন্ধ হওয়ার উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে যে সকল মহিলার ঋতুস্রাবের সম্ভাবনা নেই তাদের লজ্জাস্থান থেকে প্রবাহিত রক্ত রগের রক্ত হিসেবে পরিগণিত হবে।

ইস্তেহাযার বিধি-বিধান

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম যে, নারীর লজ্জাস্থান থেকে প্রবাহিত রক্ত কখনো কখনো হায়েয হিসেবে এবং কখনো ইস্তেহাযাহ হিসেবে বিবেচিত হয়। যখন হায়েয হিসেবে গণ্য হবে তখন হায়েযের বিধি-বিধান কার্যকরী হবে। আর যখন ইস্তেহাযাহ হিসেবে গণ্য হবে তখন ইস্তেহাযার নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে।

ইতোপূর্বে হায়েযের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এখন ইস্তেহাযার বিধি-বিধান তুলে ধরা হলো।

মূলত ইস্তেহাযার হুকুম আর পবিত্রতার হুকুম একই। মুস্তাহাযাহ নারী এবং পবিত্র নারীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।

১. মুস্তাহাযাহ নারীর ওপর প্রতি সালাতে অযু করা ওয়াজিব। প্রমাণ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছেন:

«ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ»

“অতঃপর তুমি প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু কর।”[20]

---

[20] ইমাম বুখারী রহ. হাদীসটিকে ‘গুসলুদ্দাম’ অর্থাৎ রক্ত ধৌত করার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে: তুমি ইস্তেহাযাহ অবস্থায় ফরয অর্থাৎ ওয়াক্তিয়া সালাতের জন্য সালাতের সময় আরম্ভ হওয়ার পরেই অযু করবে। আর নফল সালাতের ক্ষেত্রে যখন সালাত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন অযু করলেই চলবে।

২. মুস্তাহাযাহ নারী যখন অযু করার ইচ্ছা করবে তখন রক্তের দাগ ধৌত করে যোনীতে তুলা দিয়ে পট্টি বেঁধে নিবে, যেন উক্ত তুলা রক্তটাকে আঁকড়ে ধরে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন:

«أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ: فَإِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَتَلَجَّمِي»

“আমি তোমাকে লজ্জাস্থানে কুরসুফ তথা নেকড়া বা তুলা ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা নেকড়া বা তুলা রক্তটাকে টেনে নিবে। জবাবে হামনাহ বললেন: আমার প্রবাহমান রক্তের পরিমাণ তদপেক্ষাও বেশি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি লজ্জাস্থানে কাপড় ব্যবহার কর। হামনাহ বললেন: প্রবাহমান রক্তের পরিমাণ তার চেয়ে আরো বেশি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন যে, তুমি তাহলে যোনীর মুখে লাগাম বেঁধে নাও।”

রক্তের দাগ-চিহ্ন পরিষ্কার করে যোনীতে তুলা দিয়ে পট্টি বাঁধার পরেও যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এ

প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে যে তিনি ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নির্দেশ দিয়েছেন:

«اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكَ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ صَلِّيْ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ»

"যে কয়দিন তুমি ঋতুস্রাবে আক্রান্ত থাকবে সে কয়দিন সালাত থেকে বিরত থাক। তারপর গোসল করে প্রতি সালাতের জন্য অযু কর এবং সালাত আদায় কর, যদিও রক্ত প্রবাহিত হয়ে চাটাইর উপর পড়ে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।"[21]

৩. সহবাস প্রসঙ্গ: সহবাস বর্জন করলে যদি কোনো বৈরিতার আশঙ্কা থাকে তাহলে ওলামায়ে কেরামের মাঝে এর বৈধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে, ইস্তেহাযার অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম জায়েয।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দশ অথবা ততোধিক সংখ্যক মহিলা ইস্তেহাযাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সঙ্গে সহবাস করতে নিষেধ করেন নি অথচ কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

---

[21] আহমদ ও ইবন মাজাহ।

“তোমরা হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাক।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২২]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে হায়েয ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয়তঃ মুস্তাহাযাহ নারীর সালাত যেহেতু জায়েয সেহেতু সঙ্গমও জায়েয। কেননা সঙ্গম তো সালাতের চেয়ে আরো সহজ। মুস্তাহাযাহ নারীর সাথে সহবাস করাটাকে ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে সহবাস করার সাথে বিচার-বিবেচনা করলে চলবে না। কারণ, এ দু’টি কখনো এক হতে পারে না। এমনকি মুস্তাহাযাহ নারীর সাথে সঙ্গম করাকে যারা হারাম মনে করেন তাদের কাছেও দুটো এক নয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকায় একটাকে অপরটার ওপর কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিফাস ও তার হুকুম

নিফাসের সংজ্ঞা: সন্তান প্রসবের কারণে জরায়ূ থেকে প্রবাহিত রক্তকে নিফাস বলা হয়। চাই সে রক্ত প্রসবের সাথেই প্রবাহিত হোক অথবা প্রসবের দুই বা তিন দিন পূর্ব থেকেই প্রসব বেদনার সাথে প্রবাহিত হোক।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন: ‘প্রসব ব্যথা আরম্ভ হলে মহিলা তার লজ্জাস্থানে যে রক্ত দেখতে পায় সেটাই হচ্ছে নেফাস।’ এখানে তিনি দুই অথবা তিন দিনের সাথে নির্দিষ্ট করেন নি। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ব্যথা যার পরিণতিতে প্রসব হবেই। অন্যথায় তা নিফাস হিসেবে পরিগণিত হবে না।

নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কোনো সময়-সীমা আছে কি না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। শাইখ তকীউদ্দীন তার লিখিত ‘যে নামগুলোর সাথে শরী‘আত প্রণেতা বিধি-বিধান সম্পর্কিত করেছেন’ পুস্তিকার ৩৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন: নিফাসের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কোনো সীমা-রেখা নেই। সুতরাং যদি কোনো নারীর ৪০ দিন অথবা ৬০ দিন অথবা ৭০ দিনেরও বেশি সময় ধরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটাও নিফাস হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু বন্ধ না হয়ে যদি বিরতিহীনভাবে তারপরও প্রবাহিত হতে থাকে তাহলে সেটাকে অসুস্থতার রক্ত বলে গণ্য করা হবে এবং তখন নির্দিষ্ট সময়-সীমা ৪০ দিনই ধার্য্য করতে হবে (বাকী সময়ের রক্ত অসুস্থতার বলে মনে করতে

হবে)। কেননা অধিকাংশ নারীর নিফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিনই হয়ে থাকে বলে একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।'

উপরোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে আমি (গ্রন্থকার) মনে করি প্রসবোত্তর রক্তস্রাব ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও যদি অব্যাহত থাকে এবং ৪০ দিনের পর বন্ধ হওয়ার পূর্ব অভ্যাস যদি তার থেকে থাকে বা ৪০ দিনের পর বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় তাহলে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর তা না হলে ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর গোসল করবে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিনই হয়ে থাকে। তবে ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর যদি আবার মাসিক রক্তস্রাব অর্থাৎ হায়েযের সময় এসে যায় তাহলে হায়েযের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর বন্ধ হলে মনে করতে হবে যে, এটা মহিলার অভ্যাস অনুসারেই হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতেও কোনো সময় এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সে হিসেবে আমল করবে। আর যদি হায়েযের সময় শেষ হওয়ার পরেও রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে তাহলে তখন ইস্তেহাযাহ গণ্য করে তার হুকুম পালন করবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রসবোত্তর রক্তস্রাব বন্ধ হলেই মহিলা পবিত্র হয়ে যাবে। এমনকি ৪০ দিনের পূর্বেই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও পবিত্র হবে, সুতরাং গোসল করে সালাত-সাওম আদায় করতে থাকবে এবং

স্বামী-স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু এক দিনের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার কোনো হুকুম নেই।[22]

স্মরণ রাখতে হবে যে, এমন কিছু প্রসব করলেই কেবল নিফাস প্রমাণিত হবে যাতে মানুষের আকৃতি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে গর্ভপাতের মাধ্যমে যদি এমন ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ভ্রূণ প্রসব করে যাতে মানুষের আকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না তাহলে প্রবাহিত রক্তকে নিফাস হিসেবে গণ্য করা যাবে না, বরং রগের রক্ত হিসেবে গণ্য করে ইস্তেহাযার নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে। মানুষের আকৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার সর্বনিম্ন সময়-সীমা হচ্ছে গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে ৮০ দিন, তবে বেশিরভাগ সময়েই তাতে ৯০ দিনে পূর্ণ আকৃতি এসে যায়। এ প্রসঙ্গে মাজ্দ ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন: 'সর্বনিম্ন সময় অথবা গর্ভধারণ করার পর থেকে ৮০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যদি প্রসব বেদনার সাথে রক্ত দেখা যায় তাহলে সে দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই করা হবে না। আর যদি ৮০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রক্ত দেখে তাহলে প্রসব পর্যন্ত সালাত-সাওম থেকে বিরত থাকবে। প্রসবের পর যদি দেখা যায় যে, প্রসূত সন্তান বা ভ্রূণের মধ্যে মানুষের কোনো আকৃতিই নেই তাহলে গর্ভবতী মহিলা তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে এবং ক্ষতিপূরণ করবে অর্থাৎ সালাত-সাওমের কাযা করবে। আর যদি

[22] মুগনী গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে।

বিষয়টি স্পষ্ট না হয় তাহলে বাহ্যিক হুকুমই মেনে চলবে অর্থাৎ সালাত-সাওম থেকে বিরত থাকবে এবং কাযা করা লাগবে না।[23]

নিফাসের হুকুম

নিম্ন বর্ণিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া হায়েয ও নিফাসের হুকুম প্রায় একই। যথা-

১. ইদ্দত প্রসঙ্গ: ইদ্দতকাল নির্ণয় করতে হবে হায়েযের দিকে লক্ষ্য করে, নিফাসের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। কেননা তালাক যদি প্রসবের পূর্বে দেওয়া হয় তাহলে প্রসবের সাথে সাথে ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে, নিফাসের মাধ্যমে নয়। পক্ষান্তরে যদি তালাক প্রসবের পরে হয় তাহলে হায়েযের অপেক্ষা করতে হবে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. 'ঈলা'র মেয়াদ: হায়েযের সময় অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে নিফাসের সময়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ঈলা'র সংজ্ঞা: কোনো পুরুষের এই মর্মে শপথ করাকে ঈলা বলা হয় যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে না বা সেজন্য এমন সময়-সীমা নির্ধারণ করে শপথ করে যা চার মাসের উপরে। এ ধরনের শপথ করার পর স্ত্রী যখন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার জন্য স্বামীর নিকট দাবী উত্থাপন করবে, তখন উক্ত পুরুষের জন্য শপথের পর চার মাস মেয়াদ

[23] শারহুল ইকনা' নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ধার্য করা হবে। চার মাসের এই মেয়াদ শেষ হলে স্ত্রীর দাবী মেনে নেওয়ার জন্য স্বামীকে বাধ্য করা হবে। স্ত্রী যদি তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে চায় তাহলে স্বামীকে স্ত্রী মিলনে বাধ্য করা হবে। আর স্ত্রী যদি তার কাছ থেকে পৃথক হতে চায় তাহলে পৃথক করতে বাধ্য করা হবে। এখানে বুঝার বিষয় হচ্ছে ঈলার হুকুম হিসেবে উল্লিখিত চার মাসের মেয়াদ চলাকালীন যদি স্ত্রীর নিফাস অর্থাৎ প্রসব জনিত কারণে রক্তস্রাব দেখা দেয় তাহলে স্বামী স্ত্রীর নিফাসের দিনগুলোকে চার মাসের মধ্যে যোগ করে হিসাব করতে পারবে না, বরং নিফাসের এই দিনগুলোকে হিসাবের আওতায় না এনে চার মাসের মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। পক্ষান্তরে চার মাসের সুনির্দিষ্ট মেয়াদ চলাকালে স্ত্রীর যদি হায়েয দেখা দেয় তাহলে হায়েযের দিনগুলোকে চার মাসের মধ্যে যোগ করতে হবে।

৩. হায়েযের মাধ্যমে নারী প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। তবে নিফাসের মাধ্যমে নয়। কেননা বীর্যস্খলন ছাড়া নারী গর্ভবতী হতেই পারে না। সুতরাং গর্ভধারণের জন্য যে বীর্যস্খলন হয় তা দ্বারা বুঝা যাবে যে নারী গর্ভধারণের পূর্বেই প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গিয়েছিল।

৪. হায়েয ও নিফাসের মধ্যে চতুর্থ পার্থক্য এই যে, হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যদি পুনরায় আরম্ভ হয় তাহলে সেটাকে নিঃসন্দেহে হায়েয হিসেবে গণ্য করতে হবে।

দৃষ্টান্ত: একজন নারীর সাধারণতঃ প্রতি মাসে ৮ দিন করে রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এক মাসে দেখা গেল যে, রক্তস্রাব চার দিন পর বন্ধ হয়ে গেছে এবং দুই দিন বন্ধ থাকার পর সপ্তম ও অষ্টম দিনে প্রবাহিত রক্তকে

অবশ্যই হায়েয বলে গণ্য করতে হবে এবং তাকে হায়েযেরই নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে। পক্ষান্তরে নিফাসের ব্যাপারটা এমন নয় অর্থাৎ নিফাস যদি ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বন্ধ হয়ে আবারো চালু হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত থাকবে। এমতাবস্থায় মহিলাকে নির্দিষ্ট সময়ের ফরয সালাত ও ফরয সাওম আদায় করতে হবে। মাসিক ঋতুবতী মহিলার জন্য ওয়াজিব ব্যতীত যা হারাম তার ক্ষেত্রেও তা হারাম হবে এবং এ অবস্থায় যে ফরয সালাত ও ফরয সাওম আদায় করা হয়েছে পবিত্র হওয়ার পর সেগুলোর কাযা করবে। অর্থাৎ ঋতুবতী মহিলাদের জন্য যেমন কাযা করা ওয়াজিব তেমনি নিফাসওয়ালীর জন্যও ওয়াজিব। হাম্বলী ফিকহবিদগণের নিকট এটাই প্রসিদ্ধ। তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে যে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এমন সময়ের মধ্যেই যদি পুনরায় চালু হয় যখন প্রবাহিত রক্তকে নিফাস গণ্য করা সম্ভব, তাহলে নিফাস হিসেবেই গণ্য করা হবে, নতুবা হায়েয হিসেবে। আবার একাধারে বিরতিহীনভাবে অনেকদিন প্রবাহিত হতে থাকলে (৪০ দিনের পর বাকী সময়) ইস্তেহাযাহ গণ্য করা হবে। মুগনী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ‘উল্লিখিত সমাধানটি ইমাম মালেক রহ.-এর অভিমতের কাছাকাছি।’ ইমাম মালেক রহ. বলেছেন যে, ‘রক্ত বন্ধ হওয়ার পর দুই অথবা তিন দিনের মধ্যেই যদি পুনরায় রক্ত দেখা দেয় তাহলে নিফাস নতুবা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে।’

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ.-এর অভিমতও এক্ষেত্রে একই রকম বলে বুঝা যায়। বাস্তবতার ভিত্তিতেও বলা সংগত যে, রক্তের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বলতে কিছুই নেই। বস্তুত সন্দেহযুক্ত হওয়ার বিষয়টি

আপেক্ষিক; যার মধ্যে মানুষ তাদের ইলম ও বোধশক্তি অনুপাতে মতভেদ করে থাকে। আর কুরআন ও সুন্নাহ কোনটা সঠিক এবং কোনটা সঠিক নয় এর পূর্ণ সমাধান প্রতিটি ক্ষেত্রেই দিয়েছে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই দুইবার সাওম রাখার এবং দুইবার তাওয়াফ করার নির্দেশ দেন নি (যেমনটি একটু পূর্বে বলা হয়েছে)। তবে হ্যাঁ, প্রথমবার আদায় করতে গিয়ে যদি এমন কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে যা কাযা না করে সেই ত্রুটির ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয় (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা)। বান্দাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে সাধ্যানুসারে সে কাজ করলে বান্দাহ তখন দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব দেন না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]

"তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।" [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬]

৫. হায়েয যদি পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে স্বামী উক্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে নিফাসের রক্ত যদি ৪০ দিনের পূর্বে বন্ধ হয়ে

যায় তাহলে প্রসিদ্ধ মাযহাব অনুসারে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া স্বামীর জন্য মাকরূহ, তবে সঠিক সমাধান এটাই যে, মাকরূহ নয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমতও তাই। কেননা কোনো কাজকে মাকরূহ বলতে হলে শর‘ঈ দলীল লাগবে। অথচ এক্ষেত্রে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ছাড়া কোনো দলীল নেই।

ইমাম আহমদ রহ. উসমান ইবন আবিল ‘আস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর স্ত্রী নিফাসের ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর কাছে আসলে তিনি বলতেন: তুমি আমার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা দ্বারা কোনো মাকরূহের হুকুম প্রমাণিত হয় না। কেননা স্ত্রীর পবিত্র হওয়া নিশ্চিত নয় বলে সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে অথবা সঙ্গমে লিপ্ত হলে পুনরায় রক্ত প্রবাহ শুরু হতে পারে এই আশঙ্কায় অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি নিষেধ করে থাকতে পারেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হায়েয প্রতিরোধকারী অথবা আনয়নকারী এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ কিংবা গর্ভপাতের ঔষধ ব্যবহার বিধান

দু'টি শর্তে হায়েয প্রতিরোধ করে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয:

১ম শর্ত: ঔষধ ব্যবহারে কোনো রকম ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা। যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কেননা কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত করো না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৫]

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন:

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا﴾ [النساء: ٢٩]

"তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

২য় শর্ত: হায়েয বা রক্তস্রাবের সাথে স্বামীর যদি কোনো হক সম্পৃক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই তার অনুমতি নিয়েই ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। যেমন, স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত পালন করে চলছে এবং ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব। এমতাবস্থায় ইদ্দতকাল দীর্ঘ করে ভরণ-পোষণ বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি স্ত্রী

হায়েয প্রতিরোধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। স্বামী অনুমতি দিলে করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না।

এমনিভাবে যখন প্রমাণিত হবে যে, হায়েয রোধ করলে স্ত্রীর গর্ভ ধারণ করা সম্ভব নয় তাহলে তখনও ঔষধ ব্যবহারের জন্যে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

উপরোক্ত দু'টি শর্ত মোতাবেক হায়েয প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয। মনে রাখতে হবে, জায়েয হওয়ার পরেও বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ব্যবহার না করাই উত্তম । কেননা প্রাকৃতিক বিষয়কে তার গতিতে ছেড়ে দেওয়া শারীরিক সুস্থতার পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক।

হায়েয আনয়নের জন্য ঔষধের ব্যবহারও দুই শর্তে জায়েয:

১ম শর্ত: কোনো ফরয বা ওয়াজিব কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঔষধ ব্যবহার না করা। যদি এমনটি হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো ফরয বা ওয়াজিব পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যদি ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে নাজায়েয হবে। যেমন, রমাযান মাস আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হায়েয আনয়নের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা, যেন সালাত এবং সাওম আদায় করা থেকে বেঁচে যায়, তাহলে তা কখনই জায়েয হবে না।

২য় শর্ত: স্বামীর অনুমতিক্রমে ব্যবহার করতে হবে। কেননা হায়েয এলে স্বামী পূর্ণাঙ্গরূপে স্ত্রী থেকে উপকৃত হতে পারে না বা নিজের কামভাব পূর্ণ করতে পারে না। সুতরাং স্বামীর অনুমতি ছাড়া এমন কিছু ব্যবহার করা স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না যার কারণে স্বামী নিজ অধিকার থেকে

বঞ্চিত হয়। যদি স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তাও হয়ে থাকে তবুও স্বামীর অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা স্বামীর যদি তালাক প্রত্যাহার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে স্ত্রী এ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করে হায়েয নিয়ে আসলে স্বামীর অধিকার দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

গর্ভরোধকারী ঔষধের ব্যবহার দুই প্রকার:

১ম প্রকার: ঔষধের ব্যবহার দ্বারা যদি স্থায়ীভাবে গর্ভধারণকে প্রতিরোধ করা হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কেননা গর্ভধারণের প্রক্রিয়াকে চিরতরে বন্ধ করলে বংশবৃদ্ধি ও সন্তানাদি কমে যাবে যা শরী'আতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ উম্মতে ইসলামিয়ার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াই শরী'আতের উদ্দেশ্য যা গর্ভধারণ প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হবে। এতদ্ব্যতীত উপস্থিত সন্তানাদি মারা না যাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মারা গেলে নারী সন্তানহীন হয়ে থাকার আশঙ্কা থেকে যায়।

২য় প্রকার: সাময়িকভাবে গর্ভরোধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা। যেমন, কোনো নারী খুব বেশি পরিমাণে গর্ভবতী হচ্ছে এবং এর কারণে শারীরিকভাবে ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা দুই বছর অন্তর অন্তর সন্তান নিতে আগ্রহী, তাহলে তার জন্যে সাময়িকভাবে ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয, তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে এবং এ ধরনের ঔষধ ব্যবহারে কোনো রকম ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবায়ে কেরাম 'আযল' পদ্ধতি

অবলম্বন করে স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হতেন, যাতে করে তাঁদের স্ত্রীগণ গর্ভবতী না হয়। কিন্তু এ পদ্ধতি অবলম্বন থেকে তাদেরকে তখন নিষেধ করা হয় নি।

প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পর বীর্যস্খলনের সময় ঘনিয়ে আসলে পুরুষাঙ্গ স্ত্রী যোনী থেকে বের করে বাইরে বীর্যপাত করাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'আযল' বলা হয়।

গর্ভপাতকারী ঔষধের ব্যবহারও দুই প্রকার:
১ম প্রকার: গর্ভপাতকারী ঔষধ গ্রহণ গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে হওয়া। এমতাবস্থায় এই ঔষধের ব্যবহার যদি গর্ভস্থ বাচ্চার মাঝে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা এটা নিষিদ্ধকৃত আত্মাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার শামিল। কুরআন ও হাদীস এবং মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষিদ্ধকৃত আত্মাকে হত্যা করা হারাম।

আর যদি প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাতের জন্য ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে ওলামায়ে কেরামের মাঝে এর বৈধতার প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ জায়েয বলেছেন, কেউ কেউ নিষেধ করেছেন, আবার কেউ বলেছেন, গর্ভ ধারণের পর থেকে আরম্ভ করে যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ভস্থ বস্তু জমাট রক্তের রূপ না নিবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ৪০ দিন অতিবাহিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গর্ভপাতের জন্য এ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয। ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউ

আবার এমনও বলেছেন যে, মানুষের আকৃতি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত গর্ভপাতের ঔষধ ব্যবহার করতে পারবে। তবে খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গর্ভপাতের জন্য ঔষধের ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উত্তম। তবে বিশেষ প্রয়োজন ও অপারগতার সম্মুখীন হলে এ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করতে পারবে। প্রয়োজনীয়তা বলতে যেমন গর্ভধারণকারীনী এমন অসুস্থ যে গর্ভধারণে অক্ষম ইত্যাদি ইত্যাদি। এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা জায়েয। কিন্তু গর্ভ ধারণের পর থেকে যদি এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যে সময়ের মধ্যে গর্ভস্থ বাচ্চার মধ্যে মানুষের আকৃতি প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে ব্যবহার করা হারাম। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

২য় প্রকার: গর্ভপাতের ঔষধ গ্রহণের দ্বারা গর্ভস্থ আত্মাকে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য নয় বরং গর্ভের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রসব আসন্ন এমন সময়ে যদি গর্ভপাতের ঔষধ ব্যবহার করতে চায় তাহলে তা জায়েয আছে। তবে শর্ত হচ্ছে এ ধরনের ঔষধ ব্যবহারের ফলে মা ও বাচ্চার যেন ক্ষতি না হয় এবং ঔষধ ব্যবহার করার কারণে যেন অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়।

যদি ঔষধ ব্যবহারের কারণে অপারেশন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলে এর চার অবস্থা, যা নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. মা ও গর্ভস্থ বাচ্চা উভয়েই জীবিত। এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া অস্ত্রোপচার জায়েয নেই, যেমন প্রসব অত্যন্ত কষ্টকর এবং ঝুকিপূর্ণ, তাহলে অস্ত্রোপচার করতে হবে। মনে রাখতে হবে একজনের শরীর

অপরজনের নিকট আমানতস্বরূপ। সুতরাং বৃহত্তর কোনো কল্যাণ সাধনে এমন কোনো হস্তক্ষেপ করবে না যা দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া বর্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রে অপারেশনের পূর্বে মনে করা হয়ে থাকে যে, কোনো রকম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, অথচ অপারেশনের পর ক্ষতি প্রকাশ পেয়ে যায়।

২. মা ও গর্ভস্থ বাচ্চা উভয়ই মৃত। এমতাবস্থায় বাচ্চাকে বের করার জন্য অস্ত্রোপচার করা জায়েয নয়। কেননা বের করার মধ্যে কোনো লাভ নেই।

৩. মা জীবিত কিন্তু গর্ভস্থ বাচ্চা মৃত। তাহলে অস্ত্রোপচার করে বের করা জায়েয আছে। তবে মায়ের কোনো প্রকার ক্ষতির যেন আশঙ্কা না থাকে। কেননা বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গর্ভস্থ সন্তানকে তো অপারেশন ছাড়া বের করা সম্ভব নয় এবং বাচ্চাকে যদি ভিতরে রেখে দেওয়া হয় তাহলে প্রথমতঃ ভবিষ্যতে পেটে সন্তান ধারণ করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়তঃ এভাবে রেখে দিলে মায়ের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া অনেক সময় স্ত্রীকে স্বামীহীনা-বিধবা হয়ে থাকতে হয় যখন মহিলা পূর্ব স্বামীর ইদ্দতের অবস্থায় থাকে। এসব কারণে অপারেশনের মাধ্যমে গর্ভস্থ মৃত বাচ্চাকে বের করা জায়েয আছে।

৪. মা মৃত এবং গর্ভস্থ বাচ্চা জীবিত। এমতাবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচানোর সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহলে অপারেশন করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যদি গর্ভস্থ সন্তানটি বাঁচবে এমন আশা থাকে, সেই অবস্থায় কিছু অংশ যদি বের হয়ে থাকে তাহলে মৃত মার পেট কেটে বাচ্চার

বাকী অংশ বের করতে পারবে। আর যদি বাচ্চার কিছুই বের না হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, গর্ভস্থ শিশুকে বের করার জন্য মায়ের পেট কাটবে না। কেননা এটা নাক-কান কেটে বিকৃত করার অন্তর্ভুক্ত। তবে সার্বিক সমাধান হচ্ছে এই যে, অপারেশন ছাড়া যদি বের করা সম্ভব না হয় তাহলে অপারেশন করতে পারবে। এ সমাধানটি ইবন হুবাইরা গ্রহণ করেছেন। তিনি 'ইনসাফ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৫৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, এক্ষেত্রে পেট কেটে বাচ্চা বের করাই উত্তম।

বর্তমান কালে এ অবস্থায় অস্ত্রোপচার করা 'মুসলা' অর্থাৎ নাক-কান কেটে শাস্তি দেওয়া হিসেবে পরিগণিত হবে না। কারণ, প্রথমতঃ পেট কেটে পরে আবার সেলাই করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ একটা জীবিত সন্তানের ইজ্জত একজন মৃত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি। তৃতীয়তঃ একটা নিষ্পাপ শিশুকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং যেহেতু গর্ভস্থ বাচ্চা জীবিত এবং নিষ্পাপ মানুষ সেহেতু অপারেশনের মাধ্যমে তাকে বের করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

সতর্কীকরণ:

উল্লিখিত যে সকল অবস্থায় গর্ভপাত করা জায়েয সে সকল অবস্থায় গর্ভপাত করতে চাইলে অবশ্যই গর্ভের মালিক তথা স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা!

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আপনাদের কাছে যা উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করে লিখার সূচনা করেছিলাম তা এখানেই শেষ। এই পুস্তিকাতে আমি শুধুমাত্র মৌলিক মাসআলাসমূহ এবং তার নিয়ম-কানূন বর্ণনা করেছি। অন্যথায় বর্ণিত মাসআলাসমূহের শাখা-প্রশাখা, আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এবং হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযার কারণে নারী জাতির বহুমুখী অবস্থার পূর্ণ বিবরণ কিনারাবিহীন সমুদ্রের মতো। তবে কোনো সমস্যার আবির্ভাব ঘটলে বিচক্ষণ ব্যক্তি মূল বিষয় ও তার নিয়ম-কানূনের ওপর ভিত্তি করে সমাধান দিতে পারবে এবং এক বিষয়কে সমপর্যায়ের অন্য মাসআলার ওপর অনুমান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে।

একজন মুফতীর একথা স্মরণ থাকা উচিৎ যে, তিনি রাসূলগণের আনীত দীন, শরী'আত ও মতাদর্শ প্রচার এবং প্রসারের জন্য আল্লাহ তা'আলা ও মানব জাতির মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারীর সমতুল্য। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে কোনো প্রশ্নের সমাধান দেওয়া তাঁরই দায়িত্ব। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ এমন দু'টি মূল উৎস যে দু'টিকে বুঝে তার ওপর আমল করার জন্য সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে কথা, যে অভিমত এবং যে সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী হবে তা ভুল বলে প্রমাণিত হবে, যা গ্রহণ করা জায়েয হবে না, বরং প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। যদি ভুল সমাধানদাতা মুজতাহিদ অপারগ হয়ে থাকেন তাহলে তাকে তার

ইজতেহাদের কারণে প্রতিদান দেওয়া হবে কিন্তু যে ব্যক্তি তার এ ভুল সম্পর্কে অবগত হবে তার জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

একজন মুফতীর জন্য কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করা, নতুন কোনো বিষয় সামনে আসলে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তার কাছে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য সাহায্য ও তাওফীক কামনা করা অত্যাবশ্যক। যে কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভিত্তিতে আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করা উচিত অথবা এমন কিছুর ভিত্তিতে আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ যা কুরআন ও হাদীস বুঝার জন্য সহায়ক হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, একটা মাসআলা সামনে আসলে ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা হয়। ফলে মাসআলাটির সুনিশ্চিত কোনো সমাধান পাওয়া যায় না এবং সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যও প্রকাশিত হয় না। কিন্তু পরক্ষণে যখন কুরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় তখন মাসআলার সমাধান ও হুকুম স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এমনটি ইখলাস, ইলম ও সঠিক অনুভূতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। কোনো প্রকার মাসআলার সম্মুখীন হলে বিলম্বে উত্তর দেওয়া একজন মুফতীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাড়াহুড়া করা মোটেই উচিৎ নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার পর আবার গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, যার ফলে উত্তরদাতাকে লজ্জিত হতে হয় এবং এ ভুলের ক্ষতিপূরণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

কোনো মুফতীর মধ্যে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে ধীর গতিতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মানসিকতা থাকলে এবং তার মধ্যে দৃঢ়তা লক্ষ্য করা গেলে তার কথার প্রতি মানুষের বিশ্বাস আসবে এবং জনসাধারণ তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার অভ্যাস লক্ষ্য করলে তার প্রতি মানুষের কোনো বিশ্বাস থাকবে না। কেননা যে কোনো কাজ তাড়াহুড়ো করে করলে ভুল হয়েই থাকে আর এ ধরনের দ্রুতগামীতা ও ভুলের কারণে তার জ্ঞান প্রদীপের আলো থেকে সে নিজে বঞ্চিত হবে এবং অপরকেও বঞ্চিত করবে।

সর্বশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দেন, অনুগ্রহ করে আমাদের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেন এবং পদস্খলন থেকে আমাদের হিফাযত করেন। তিনিই অসীম দাতা এবং পরম দয়ালু।

সমাপ্ত

এটি নারীদের প্রাকৃতিক রক্তস্রাব বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। রক্তস্রাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে গ্রন্থটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হচ্ছে : হায়েযের অর্থ ও হিকমত, হায়েযের সময়সীমা, হায়েযের জরুরী অবস্থা, হায়েযের হুকুম-আহকাম, ইস্তেহাযা ও তার বিধান, নিফাস ও তার হুকুম, হায়েয বন্ধ অথবা সংঘটিত করার ঔষধ ব্যবহারের হুকুম। আশা করি উক্ত বইটি পড়ে পাঠক-পাঠিতাগণ উপকৃত হতে পারবেন।